শেষবিকেলের পথরেখা

হাসনাত আহমেদ

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভার্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো।

চৌত্রিশ বছর ধরে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

শেষবিকেলের পথরেখা

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বইঃ

- জীবনক্ষুধা
- প্রতিদান চাইনি
- কিছু কথা কিছু গান
- অপেক্ষা

শেষবিকেলের পথরেখা

হাসনান আহমেদ

নবকৃতি

শেষবিকেলের পথরেখা

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৭

প্রকাশক
প্রকৃতি
১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.books@gmail.com

প্রচ্ছদ
মনন মোর্শেদ

মুদ্রণ
অর্ক
৩/১, ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯১৪৮৭-০-৮

মূল্য: ২৫০ টাকা

Seshbikeler Patharekha by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, December 2017
Price: Tk. 250

উৎসর্গ

এ সংসারে যারা শুধু নিঃস্বার্থভাবে দিয়েই গেলো
প্রতিদানে প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই পেলো না
তাদের উদ্দেশে

আমার কথা

মনের অবাধ্য হয়ে কিছুই করা যায় না। কয়েকটা ছোটোগল্পের সম্মিলনে একটা সংকলনগ্রন্থ লিখতে বসেছিলাম। গল্পের কাহিনী ও পরিপ্রেক্ষিত সবই প্রস্তুত। কিন্তু মনটা চলে গেল অন্য বিষয়ের দিকে— অন্য কোথাও।

অল্প সময় হাতে নিয়ে এ-বইটা লেখা শুরু করলাম। মাত্র পনেরো দিনে শেষও হয়ে গেল। নাম দিলাম 'আত্মপ্রবঞ্চনা'। প্রচ্ছদ-অলংকরণ ও পৃষ্ঠাবিন্যাসের জন্য পাঠালাম। যেহেতু চলমান সমাজের ছোট-বড় আত্মপ্রবঞ্চনার রূপরেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে বইটা অস্তিত্বশীল হয়েছে এবং ঘটনার বাস্তবতায় আত্মপ্রবঞ্চনা সবখানেই বিদ্যমান, সেজন্য এ নাম।

প্রকাশনার আগে কী-যেন-কী ভেবে মন বললো, বইটার নাম 'শেষবিকেলের পথরেখা' দিলে কেমন হয়? যে-ই বলা, সে-ই কাজ। নাম হলো 'শেষবিকেলের পথরেখা'। বড় মেয়েটাও সম্মতি দিলো।

জীবনের এই 'পথরেখা' কত গভীর, না উপরিগত— এটা অনুভবের বিষয়। মানুষের মনভেদে ভিন্ন হতে পারে, তবে তা সময়ানুগ। কখনো 'কুল রাখি, না শ্যাম রাখি' এ দোদুল্যমানতা, আবার কখনো 'কুল' ও 'শ্যাম' দুটোকেই ধরে রাখার অপকৌশলী কর্মবিপাক পথরেখাকে কলুষিত করে ফেলে, যা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর।

আমার লেখায় কাটাকাটির বহর দেখলে বরাবরই অনেক কম্পোজিটার দূরে পালায়। তাই বলা যায়, নিজেই কাজটার ধকল সামলাতে হলো। এ-বিষয়ে আমাদের বিভাগের চাঁন মিয়ার সহযোগিতা স্মরণযোগ্য।

লেখার প্রেক্ষাপট ও ভাষাশৈলীর তত্ত্ব-ব্যবচ্ছেদ ভাবুক পাঠকসমাজের উপর ছেড়ে দিলাম।

ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৭

(হাসনান আহমেদ)

শেষবিকেলের পথরেখা

১.

ট্রেন থেকে নেমে ব্যাগ হাতে আহমাদ মুর্তজা প্লাটফরম বরাবর হেঁটে চলেছেন। প্লাটফরমের শেষ প্রান্ত থেকে আরো কিছু দূরে পাশের রেলিং ধরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। মুর্তজা দূর থেকে তাঁকে লক্ষ করছেন আর সামনে হাঁটছেন। মহিলাও যেন তাঁর দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মুর্তজা প্রায় তাঁর কাছাকাছি চলে এসেছেন। মহিলা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনি মুর্তজা দাদা না?'

মুর্তজা তাঁর দিকে ভালো করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, স্মৃতির পাতা হাতড়ালেন। কিন্তু চিনে উঠতে পারলেন না।

ছিপছিপে লম্বা একহারা গড়নের চেহারা। চেহারায় কমনীয়তা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। কঙ্কালসার রোগা শরীর। চোয়াল দুপাশে ভেঙে গেছে। মহিলাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। স্টেশন থেকে দূরে এই মহিলা কেন একাকী রেলিং ধরে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, মুর্তজা কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।

'আপনি কে বলুন তো? আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছিনে।' মুর্তজা বয়সের গাম্ভীর্য রেখে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন।

'আজ মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছর পর দেখা, না চেনারই কথা। আমিও অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে লক্ষ করছি। আপনার হাঁটার ধরন ও নাকের গঠন দেখে মোটামুটি বুঝে ফেলেছি যে, আপনি মুর্তজা দাদা। আমি সেতু। আপনার তিন ক্লাস নীচে পড়তাম। আপনাকে নিয়ে আমরা কত স্বপ্নই না দেখতাম! অনেকটা পথ একসাথে স্কুলে যাতায়াত করতাম। আপনার সাথে কত রসিকতাই না করেছি! জীবনটা কেমন জানি হয়ে গেল! আমাদের চাওয়া-পাওয়া একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এখান থেকে বারো মাইল দূরে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি ওখানেই থাকি।'

মুর্তজা প্রথমত হতচকিত হয়ে পরে নিজেকে সংযত করে নিলেন। স্মৃতির পাতা না, যেন একটা পুরো জীবনপাতা তাঁর সামনে খুলে গেল। অতীতের দিকে তাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। সেই জীবন, আর এই জীবন! এই সেই সেতু! এত বছর পর সেতুর দেখা মিললো। সেতুর সাথে এ জীবনে আর দেখা না-ও হতে পারতো।

'তা তুমি এখানে একা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? তোমার শরীরটা দেখে তো খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে। কোথায় গিয়েছিলে?'

'একা না, আমার সাথে আরো লোক আছে। ওরা ঐ দিকে গেছে। কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমার ব্রেইন স্ট্রোক করেছিল। ওখানে এক বছর ধরে চিকিৎসা নিচ্ছি। এখন একটু একটু হাঁটা-চলা করতে পারি। অনেক দিন বিছানায় ছিলাম। কোনো কথা

মনে রাখতে পারিনে। মাঝেমধ্যে মূর্ছা যাই। কয়েক দিন বিছানায় কাটাই, আবার উঠি। এমন করতে করতেই হয়তো কবে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু এতটা বছর পর শেষ জীবনে এসে যে আপনার দেখা পাব, ভাবিনি। আমার খুব ভালো লাগছে। আপনি কেমন আছেন?'

তার অসুস্থ রোগাক্লিষ্ট শরীরের দিকে তাকিয়ে মুর্তজার মনটা আবেগে উথলে উঠতে চাইল। মনে হলো, যেন সেতু এখনো সেই ছোট্ট সেতুই রয়ে গেছে। তার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে হৃদয়ের যত স্নেহ-ভালোবাসা উজাড় করে দিতে ইচ্ছে করলো। এতটা বছর পরে সেতুদের হারানোর ব্যথা মনকে আবার নতুন করে আচ্ছন্ন করে তুললো। চোখের পানি ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠলো। চোখ দুটো পানিতে টলমল করছে। কেউ একটু দৃষ্টি দিয়ে তাকালেই চশমার ফাঁক দিয়ে তা বোঝা যায়।

একটু পরে একটা মেয়ে ও পাঞ্জাবি-পরা এক বয়স্ক ভদ্রলোক এলেন। সেতু মেয়েটাকে নিজের মেয়ে ও ভদ্রলোককে মামা বলে পরিচয় করিয়ে দিল। তার এক ছেলে এক মেয়ে বলে জানালো।

মুর্তজা সেতুর সাথে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অনেক কথাই বললেন। অনেক খোঁজখবর নিলেন। সেতু মুর্তজার ফোন নম্বর চেয়ে নিল। নিজের ফোন নম্বর তাঁকে দিল। ফোন করলে কোনো অসুবিধা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলো। মুর্তজা ঘাড় নেড়ে কোনো অসুবিধা নেই বলে জানালেন।

সেতু বললো, 'মুর্তজা ভাই, যে কদিন বেঁচে আছি খোঁজখবর নেবেন।'

মুর্তজা সামনের দিকে পা বাড়ালেও কয়েক বার পিছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন, সেতু তার আঁচল দিয়ে বার বার চোখ মুছছে, আর মুর্তজার চলে-আসা পথের দিকে উদাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুর্তজা সেতুর মনের অবস্থা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারলেন। কিছুদূর হেঁটে এসে রিক্সায় চড়লেন। বাসস্ট্যান্ডে গেলেন, বাসে উঠে সিটে বসলেন। সেতুর মুখস্মৃতি ও আঁচল দিয়ে বার বার চোখ মোছা ভুলতে পারছেন না।

বাস সামনে চলছে। পাকা রাস্তার দুধারে সারি সারি গাছ। পড়ন্ত বিকেলে গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলছে। তিনি এত বছর পর এই জীবন-বিকেলের প্রান্তসীমায় এসে আটত্রিশ বছর আগে ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতিবিজড়িত মনের ক্ষতচিহ্নের উপর চোখ বোলাচ্ছেন। সেতু, তার মা, বড় বোন, ভাই ও পরিবারের সবার কথা ভাবছেন। সবাইকেই তো মুর্তজা একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন, নিজের মানুষ বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু কীভাবে সব ওলটপালট হয়ে গেল। জীবনটা কেন যেন পাল্টে গেল। গতিপথ বেঁকে দুভাগ হয়ে গেল। জীবনের চাওয়ার সাথে অনেক পাওয়াই কেন যেন গরমিল হয়ে যায়!

ভাবুক মুর্তজার চলন্ত বাসের সীটে বসে খুব খারাপ লাগছে। জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছেন। বাস চলছে। ছোটোবেলায় সিনেমায় দেখা একটা দৃশ্যপট চোখে ভেসে আসছে। গাড়োয়ান ছইঘেরা গরুর গাড়ি চালিয়ে জনশূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির সামনে বসে গান গাচ্ছেঃ

'তোমার লাগি হইলাম দেশান্ত-অ-অ-অর,
আমি পরকে করলাম আপন আমার আপন হইল পর,
বন্ধু রে-এ-এ ...।'

মুর্তজা গ্রাম থেকে মূলছিন্ন হয়ে গেছেন। গ্রামে এখন তাঁর আর কেউ নেই। তবে দু-চার বছর পর পর কোনো কারণে আসতে হয়। পঁয়ত্রিশ বছরের কম বয়সের লোকজন অধিকাংশই অচেনা। দীর্ঘ তিন যুগ রাজধানী শহরে যেন বেওয়ারিশ বসবাস। ভাসমান জনস্রোতের সাথে বিভিন্ন অলিতে-গলিতে অবিরাম ভেসে চলেছেন। স্থায়ী ঠিকানা লিখতে গেলে এখনো গ্রামের ঠিকানা লেখেন। অথচ গ্রামের সাথে যোগসূত্র হারিয়ে গেছে।

পরের দিনই মুর্তজা ঢাকায় ফিরেছেন। এক দিন পর সেতুর ফোন এলো।

'দাদা, সেদিন দেখা হবার পর থেকে আমি অস্থির হয়ে গেছি। আরো কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে হয়তো ভালো লাগত। অনেক কষ্টে আপনাকে আমি চিনেছি। ভাবতেই পারছিলাম না এভাবে আপনার দেখা পাব। আপনার শরীর-স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে গেছে! আপনার সেই ফর্সা চেহারা কালো হয়ে গেছে, যদিও সেই চঞ্চলতা ভাব রয়ে গেছে। এই দু দিন আপনার মুখচ্ছবি ভুল হচ্ছে না। আপনাকে হারিয়ে আমরা অনেক বড় কিছু হারিয়েছি। আপনাকে পেলে আমাদের জীবনের অনেক পরিবর্তন হয়ে যেত, জীবনটাই হয়তো ভিন্ন হতো। শুনেছিলাম আপনি শিক্ষকতা করেন। এখনো কি সেই শিক্ষকতাই করেন?'

'হ্যাঁ। এভাবেই বাকি জীবনটাকে পার করে দিতে চাই।'

'আপনার ছেলেমেয়ে কজন? আপা কেমন আছেন?'

'এক ছেলে, এক মেয়ে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। একটু খুলে বলি। জীবনের সব চাওয়া পাওয়া হয় না। ওরা ওদের আম্মার সাথে থাকে। তোমার আপার খবর আমি তেমন একটা রাখিনে। প্রায় দশ বছর হতে চললো আমরা দূরে দূরে থাকি। যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। আমি থাকি আমার কলেজ থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে এক রুমের একটা বাসায়। ওরা থাকে কলেজ থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে। আমি ওখানে মাঝেমধ্যে যাই। মূলত বাজার-সওদা ও টাকার জোগান দেওয়ার জন্য। আমার ছেলেমেয়ে দুটোই ভালো। ব্রোকেন ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা সাধারণত মানুষ হয় না– বিপথে যায়। আমার ভাগ্য ভালো যে ওরা তা যায়নি। জীবনের বাস্তবতাকে বুঝেছে।

আমার মতো আমি থাকি। বলা যায় ভালোই আছি। ছেলেমেয়ে দুটোর মুখের দিকে তাকিয়েই মোটামুটি বেঁচে আছি। দূরে থাকলেও ওদেরকে ভালো উপদেশ দিই, ভালো পথে চলতে বলি। সত্যি বলতে ওদের জন্যই আমার বেঁচে থাকা।'

মুর্তজা ইতস্তত না করে অনেক ভিতরের কথাই সেতুর কাছে বলে ফেললেন।

'দাদা, সেদিন আপনার শরীরের অবস্থা দেখে সত্যিই আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।'
'তোমার শরীরের অবস্থা দেখে তো আমি আরো কষ্ট পেয়েছি।' মুর্তজা কথায় জোর দিয়ে উত্তর দিলেন।

আরো বললেন, 'ভালোই হলো, এতটা বছর পর তোমার সাথে যোগাযোগ হলো। অন্তত মনের কথাগুলো শেয়ার করা যাবে। তোমার কোনো আপত্তি না থাকলেই হয়।'

'না, আপত্তি থাকবে কেন?' মুর্তজার কথা শেষ না হতেই সেতু মুর্তজাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'আমাদের সংসারে আমি বেশ ভালোই আছি বলতে হবে। আপনার দুলাভাই তো দুনিয়াদারির এত খোঁজখবর রাখে না। সরকারি কোম্পানির স্টোর নিয়েই পড়ে থাকে, আর নামাজ। কোনো ঝুট-ঝঞ্ঝাটে যায় না। কোনো খারাপ কাজের মধ্যে নেই। এই স্টোরে চাকরি করে অনেকেই জীবনে অনেক কিছু করে ফেলেছে। আমাদের সংসার সেই নির্দিষ্ট কম বেতনে কষ্টেসৃষ্টে চলছে। ধনী হবার বাসনা আমাদের নেই। আমিও আপনার দুলাভাইকে সৎপথে রোজগার করতে বলি। অবৈধ উপায় থেকে দূরে থাকতে বলি। কোনো হারাম যেন আমার শরীরের রক্তে না ঢোকে সে চেষ্টা করি। কথায় ও কাজে মিল রাখার চেষ্টা করি। মিথ্যাকে এড়িয়ে চলি। নইলে যে আমাদের সব ইবাদত বরবাদ হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে প্রতি রাতে এক লাখ টাকা রোজগার করা সম্ভব। এই স্টোর থেকে এর আগে অনেকেই এভাবে ধনী হয়েছে। আমি তো মৃত্যুর দিন গুনছি। নামাজ-রোজা-আখেরাত নিয়ে পড়ে আছি। গরিবানা হালে আল্লাহ ভালোই রেখেছে। সত্য পথে চলি। এভাবে দিন কাটিয়ে যেতে পারলেই হয়।'

সেতু এবার একটু থামলো।

'টাকাপয়সা নিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনা আমারও মানায় না। কারণ আমিও তো একজন কলেজশিক্ষক।' মুর্তজা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

মুর্তজা একটু রাশভারী লোক, কথাবার্তা কম বলেন, সংযত হয়ে চলেন। এক কথার লোক। কোনো কিছুতে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলেন। 'হ্যাঁ' 'না'-এর মাঝামাঝি কিছু বোঝেন না। এ সমাজে এটাই তাঁর অসুবিধা। তাঁকে কেনা যায় না— এক টাকাতেও না, হাজার কোটি টাকাতেও না। মোট কথা, তিনি বিক্রিযোগ্য কোনো পণ্য নন। যা বোঝেন, সোজাসুজি বোঝেন, খোলাখুলি বলেন। জীবনের ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না, বুঝতে চানও না। কোনো দুই নম্বরি কাজে ও কথায় উনি যান না। প্রাইভেট টিউশনি

পছন্দ করেন না, ফলে আয়-রোজগার কম। সংসারে অর্থ রোজগারের টানাটানি নিত্য ঘটনা। শ্বশুরবাড়ির সাথে মনোমালিন্যের প্রধান কারণও এই অর্থ সংকট, সততা ও অপ্রিয় সত্য কথা বলা। মুর্তজার স্ত্রী বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির চলাফেরা ও চিন্তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। তাই তার ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অভাব-অভিযোগ ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়।

মুর্তজার স্ত্রী সালেহা বেগম। সাংসারিক মহিলা। মুর্তজার সোজাসুজি কথাবার্তা ও চালচলন, গরিবানা হাল, শিক্ষকতা পেশা যে সালেহা বেগমের মা-বাপ ও ভাইদের আদৌ পছন্দ না, তা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু মুখ ফুটে মুর্তজাকে কখনো বলে না। মুর্তজার শ্বশুর-শাশুড়ির ঠোঁট পাতলা। কথা বলতে কিছুই মুখে আটকায় না। মুর্তজাকে অনেক কথা সরাসরি না বললেও বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে কথা ছুড়ে মারে। ঐ বাড়ির বউগুলো মুর্তজার খুব ভক্ত। অনেক গা-জ্বলা কথা মুর্তজার কানে আসে। মুর্তজা নীরব থাকেন। সালেহা বাপের বাড়ির কোনো কথা সব সময় চেপে রাখার চেষ্টা করে। সালেহার বাপ-মা মুর্তজা সম্বন্ধে অনেক আপত্তিকর ও অশালীন কথা সালেহার সামনে বলে। সালেহা শুনে দু চোখের পানি নীরবে ফেলে। বাপ-মা এতে আরো বলতে থাকে, 'দেখেছো, মেয়েটা খুব কষ্টে আছে, চোখের পানি শুকাচ্ছে না। আমাদের কথায় মেয়ের দুঃখ উথলে উঠেছে।' সালেহা চুপ থাকে।

শ্বশুরবাড়ির দৃষ্টিতে মুর্তজা একজন বোকা মানুষ, নিজের ভালো বোঝে না, এ যুগের জন্য অচল। তাদের বক্তব্য, এ বাড়িতে দুজন জামাই আছে– একজন চাকরি করে, অন্যজন মাস্টারি করে। আজকাল টাকা পথে-ঘাটে উড়ে বেড়াচ্ছে, শুধু ধরার কৌশল জানলেই হয়। মুর্তজার তা ধরার যোগ্যতা নেই, তাই তার এ বেহাল অবস্থা। তারা মাস্টারের সাথে মেয়ে বিয়ে দিয়ে খুব ভুল করে ফেলেছে। ঘটক তাদেরকে ঠকিয়েছে।

মুর্তাজাকে নিয়ে সমালোচনা ও কান্নাকাটির খবর কখনো মুর্তজার কানে এলে তিনি সালেহাকে জিজ্ঞেস করেন; সমালোচনা ও কান্নাকাটির কারণ কী তা জানতে চান। সালেহার চোখ দিয়ে আবার পানি পড়তে থাকে। এতে মুর্তজা কখনো রেগে যান। অর্থহীন কান্নাকাটির কারণ বোঝা কঠিন। তাঁর রাগ দেখলে সালেহা বলে, 'তোমার সমালোচনা দেখলে আমি সহ্য করতে পারিনে, তাই চোখে পানি আসে।'

মুর্তজা বলেন, 'তোমার বাপ-মা যখন আমার সমালোচনা করে, তুমি কি কোনো প্রতিবাদ করেছিলে? নীরব কান্নাকাটি করে তাদের সমালোচনাকে আরো বরং উস্কে দিয়েছিলে। তাদের সমালোচনাকে আরো সাপোর্ট করেছিলে। তোমার এ-ধরনের কান্নার কোনো মানে হয় না। যে-কেউ যে-কোনো দিকে তোমার এ কান্নার অর্থ করতে

পারে। হয়তো তুমি সমালোচনায় যোগ দেবে, নইলে সত্য বলে সমালোচনার প্রতিবাদ করবে। চুপ করে চোখের জল দেখানোর কোনো অর্থ হয় না।'

সালেহা চুপ করে থাকে। মাঝেমধ্যে তর্কে নেমে পড়ে। উভয় দিক বজায় রেখে চলতে চায়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সালেহা প্রথমত বাপ-মা, ভাই-বোনের পক্ষে তর্ক করে, তর্কে না পারলে চুপ থাকে এবং মনে মনে বাপ-মা, ভাই-বোনকেই সমর্থন করে। তাদের উপর ভরসা করে। কথা-বার্তায় চাল-চলনে বোঝা যায়। কিন্তু মুখে স্বীকার করে না।

মুর্তজা মাঝেমধ্যেই বলেন, 'তোমার জন্মটাই হয়েছিল তোমার মা-বাপ, ভাই-বোনদের যত অপকর্ম আমার কাছে ঢেকে রাখার জন্য।'

সালেহা মুর্তজাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। মুর্তজার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সালেহা একাত্ম হতে পারে না। দূরত্ব রয়ে যায়। মুখে স্বীকার না করলেও চোখে ধরা পড়ে। 'ওরা' এবং 'আমরা' শব্দ দুটো ওর মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

মুর্তজার চোখে সালেহার দোষ হলো, সালেহা মা-বাপ, ভাই-বোনদের অনৈতিক ও অযৌক্তিক মনোভাবকে বিনা বিচারে সমর্থন করে। কখনো নীরব থাকে। মুর্তজা বলে, 'কেন তুমি তাদের অন্যায়কে ভালো চোখে দেখো, প্রতিবাদ করো না?'

সালেহার অভিযোগ, 'আমার বাপ-মা অন্যায় করলেও তুমি তা বলবে কেন? এটা তাদের ব্যাপার। তুমি কথায় কথায় তাদের দোষের দৃষ্টান্ত টানবে কেন?'

সালেহা তার বাপ-মার চিন্তাধারা আঁকড়ে ধরে আছে। বুদ্ধি যা করে, মনে মনে করে। কাউকে ভুল বুঝলেও মনে মনে বোঝে। নিজের অনুভূতি সহজে প্রকাশ করে না। চাপা স্বভাবের। কখনো-সখনো পুষে-রাখা অযৌক্তিক ক্ষোভের কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে। তখন মনের ভিতরের আসল খবর পাওয়া যায়।

মুর্তজা ছেলেমেয়েকে নানা-নানির বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে চান। তাঁর ভয়, সেখানে বেশি মেলামেশা করলে তারাও অনৈতিক কাজ শিখবে। নিজেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন।

চিন্তাধারা ও মানসিকতার বৈপরীত্য দাম্পত্যজীবনে সুন্দরভাবে পথ চলার ও সুখী হওয়ার অন্তরায়। সব সময় মতবিরোধ লেগেই থাকে। সালেহার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সে মুর্তজার উদারনৈতিক মন-মানসিকতাকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

এভাবেই দিন চলে যাচ্ছে। দুটো পরিবারের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক অবিশ্বাস আর দুর্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিশ বছর পেরোনোর পর, মুর্তজা একা আলাদা বাসায় বসবাস শুরু করে দিয়েছেন। ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকালেই মুর্তজা কিছুই করতে পারেন না। আবার সংসারেও অশান্তি— মন বসে না। তিনি

উভয় সংকটে। বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় মুর্তজার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করেন না। কিছু খেতে গেলে ছেলেমেয়ের মুখচ্ছবি ভেসে উঠে। মুর্তজা মুখ থেকে নামিয়ে রাখেন। ভালো কোনো মনোমতো জিনিস কেনা ও খাওয়া এজন্যই তিনি বাদ দিয়েছেন। কখনো ভালো কিছু ফলমূল, মিষ্টি কিনে বাসায় নিয়ে যান। দিয়ে রেখে চলে আসেন। ছেলেমেয়ে খাবে এই ভেবে তৃপ্তি পান। ছেলেমেয়ে দুটো মাঝেমধ্যে মুর্তজার কাছে তাঁকে দেখতে আসে। এ সময় তিনি বিভিন্ন জিনিস কিনে নিয়ে এসে ছেলেমেয়েকে পেট পুরে খাইয়ে তৃপ্তি পান। কিছু অংশ আবার ছেলেমেয়ের সাথে দিয়ে দেন। কেন দেন তা তিনি নিজেও বোঝেন না। হয়তো বিশ-পঁচিশ বছর বাসায় যদি কেউ একটা বিড়ালও পোষে, তার প্রতিও একটা মমতা জন্মায়, তাই।

ছেলেমেয়ে দুটো মা-মুখী বলা যায়। বাপকেও তারা ভালোবাসে, তা মুর্তজা বোঝেন। তবে তারা উভয় সংকটে আছে, এটা বোঝা যায়। মুর্তজা ছেলেমেয়ের কাছে কখনো মায়ের দোষ বলেন না। বিষয়টা এলেই এড়িয়ে যান। আসলে একজন মায়ের পক্ষে ছেলেমেয়ের যত কাছাকাছি আসা যায় এবং বাপ ও বাপের বংশ সম্বন্ধে যেসব খারাপ কথা তাদেরকে বলা যায়, একজন বাপের পক্ষে ইচ্ছেমতো তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর ছেলেমেয়েরা সব সময় মায়ের কাছাকাছি থাকে বলেই মা-মুখী হয়ে পড়ে। বাপের তুলনায় মায়ের দরদটা বেশি বোঝে। এতে মুর্তজা কোনো আপত্তি করেন না, কিছু বলেনও না, বরং তাদের মাকে দেখে রাখতে বলেন। মুর্তজা তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে যান। তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তাঁর তৃপ্তি। তাঁর ভবিষ্যতের আর কোনো আশা নেই।

মুর্তজা সেতুর বিভিন্ন কথার উত্তর দিচ্ছেন, আবার নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়েও ভাবছেন। সব কথা সেতুকে বলতে পারছেন না।

সেতু বললো, 'দাদা, আপনার ঠিকানাটা দিন। এবার আপনার দুলাভাইয়ের সাথে ঢাকায় গেলে আপনার ওখানে যাব।' কথাটা বলে সেতু হাসতে লাগলো। মুর্তজাও রসিকতা করলেন। বললেন, 'আমার বাসা কলেজ থেকে দেড় কিলোমিটার পূর্বদিকে গিয়ে রহিম ব্যাপারির বাড়ির পাশে।'
'রহিম ব্যাপারির বাড়ির ঠিকানাটা আবার কী?'
'কেন, ঐ যে, আমি যে ভদ্রলোকের বাসায় ভাড়া থাকি তার পাশের বাসা। একদম পাশাপাশি বাসা।'

দুজনেই হাসলো। 'তাহলে আপনার বাসায় আমার জায়গা দেবেন না?' সেতু হাসতে হাসতে বললো।

‘না, সে কথা তো বলিনি। জীবন ভোলা সহজ, কিন্তু তোমাকে ভোলা কঠিন। তোমার শরীরের যে অবস্থা, এবার ঢাকায় এলে অবশ্যই বাসায় আসবে। আমি তোমাকে একটা ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। দেখবে তুমি সুস্থ হয়ে গেছো।’ মুর্তজা আদরের সুরে বললেন।

‘আমি যতটুকু বুঝেছি, আপনার তো কোনো চাল-চুলো নেই। বুড়ো ব্যাচেলর হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন।’

‘সে ব্যবস্থা একটা হবে। এক নাইয়ার এক নাও, নি নাইয়ার শতেক নাও। আশপাশ খাবার হোটেল আছে না!’

‘ঐ যে টিভির সরেজমিন প্রতিবেদনে মরা মুরগির যে ঠিকানা প্রায়ই দেখায়, আপনি সেখানে আমাকে খাওয়াবেন? ছ্যা-ছ্যা, থু! মনে হলেই ঘেন্না লাগে, বমি চলে আসে।’ সেতু হাসতে হাসতে থুথু ফেলার মতো করতে লাগলো।

‘কী আর করা! আমি মুরগি খাই, না মোরগ খাই, ওসব বুঝিনে। মাংস নামের একটা কিছু খাই। আমি বুড়ো ব্যাচেলর হিসেবে মনের অজান্তে ওগুলোই খেয়ে বেঁচে আছি। হোটেলের অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের সন্দেহযুক্ত খাবার খেতে আমারও রুচিতে বাধে, মুখে উঠতে চায় না, তবু ‘অগত্যা মধুসূদন’। এজন্যই তো শরীরের এই অবস্থা। তুমি ভালো খেতে চাইলে আমার জন্য দুটো মুরগি বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে এসো। একসাথে বসে সবাই মিলে খাওয়া যাবে।’

‘আচ্ছা, দেখবেন এবার সত্যি সত্যি বাসায় গিয়ে হাজির হব। নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াব। দাদা, আপনাকে তো এখনো বলা হয়নি। বাড়িতে এসেই ছেলেমেয়েকে আপনার কথা সব বলেছি। ছেলের বাপকেও বলেছি। আপনার কথা শুনে ওরাও খুব আনন্দিত। ওরা আপনাকে দেখতে চায়।’

২.

মুর্তজা কলেজ থেকে ফিরে বিকেলের দিকে সাধারণত বিশ্রাম নেন। সন্ধ্যার পরে হাতে সময় থাকে। বই পড়েন, বাসায় একটা খবরের কাগজ নেন, দুটো কাগজ কলেজ থেকে ফেরার সময় সাথে নিয়ে আসেন— সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন, কিংবা পুরোনো দিনের গান শুনে সময়টা পার করেন। চার তলা বাসার ছাদে একটা রুম, সাথে টয়লেট আছে। রান্নার ব্যবস্থাও আছে— তা তিনি কম ব্যবহার করেন। বাসার দক্ষিণ ও পুব দিকটা ফাঁকা। নিভৃতচারী, আত্মভোলা মুর্তজার দিনগুলো জানালা দিয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেই অনেকটা কেটে যায়। কখনো ছাদে চেয়ার নিয়ে বসেন। বেশি

খারাপ লাগলে ছেলেমেয়ের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেন। তাদের পড়ার খোঁজখবর নেন। জীবনে পাওয়ার তেমন কিছু নেই। তেমন আশাও নেই। ছেলেমেয়ে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, একটা কর্মজীবন বেছে নিয়েছে, এটা দেখে মরতে পারলেই চাওয়া-পাওয়া পরিপূর্ণ হবে। যদিও তা দেখে যেতে পারবেন বলে তাঁর বিশ্বাস হয় না। এ দেশের নিয়ম-কানুন, সামাজিক পরিবর্তন তাঁর মনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি যা চান, হয় তার বিপরীত। যা শোনেন ও দেখেন, অনেক কিছুই তাঁর মন মেনে নিতে চায় না। তিনি দেশ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে অনেক ভাবেন কিন্তু কোনো আলোচনা পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতে চান। আবার বেশি বিরক্ত হয়ে গেলে কটু মন্তব্য করতে ছাড়েন না। গলায় ফুলের মালা দিলেও যা বলেন, গলায় রশি ঝুলালেও তা-ই বলেন। কোনোমতেই আত্মপ্রবঞ্চনা করেন না। এতে অনেকেই নাখোশ হয়। 'গরম ভাতে বিড়াল বেজার' আর কী! তবু তিনি যা বোঝেন, কাউকে ছাড় না দিয়ে নির্দ্বিধায় বলে যান— কেউ শুনুক, অথবা না শুনুক।

সেতু ফোন করেছে আজ ছয়-সাত দিন হতে চললো। মুর্তজা কলেজ থেকে এসে বিকেলে সেতুকে ফোন দিলেন। ভালো-মন্দ কুশল বিনিময় হলো। সেতু বললো, 'দাদা, আমার সব কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার শরীরটা এতটা ভালো নেই। তবু আপনার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি বললাম, ভালো আছি। আপনি বলছেন, শুয়ে আছি। আমার ধারণা আপনি ঘরের মধ্যে একাকী চেয়ারে বসে আছেন। আমার বিশ্বাস মোবাইল ফোন মানে মিথ্যে কথা। মোবাইল ফোনের যত প্রসার বাড়ছে, সমাজে মিথ্যা কথারও তত প্রসার বাড়ছে। কেউ তো আবার ডাহা মিথ্যে কথা বলে পার পেয়ে যাচ্ছে।'

'এ তো টেকনোলজির খারাপ দিক। ভালো দিকও অনেক আছে— বরং বেশি আছে। আমরা খারাপ দিকটা না ব্যবহার করলেই হলো। আমি ঘরের মধ্যে সত্যিই একাকী বিছানায় শুয়ে আছি।' মুর্তজা বললেন।

'সারাদিন কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেন?' সেতুর প্রশ্ন।

'দুপুরে একটা পরিবার আমাদের অনেককেই অফিসে মাস চুক্তিতে লাঞ্চ দিয়ে যায়। সন্ধ্যায় আমার জন্য দুটো রুটি, কিছু সব্জি এটেনডেন্টের মাধ্যমে প্রায়ই পৌঁছে দিয়ে যায়। সকালে বাইরে বেরিয়ে কোথাও নাস্তাটা সেরে নিই। এভাবেই চলে যাচ্ছে। ছুটির দিনগুলোতে অবশ্য বেশ অসুবিধে হয়। তখন গোলেমালে দিন পার করা ছাড়া আর পথ কী!' মুর্তজা সোজাসুজি উত্তর দিলেন।

'বাইরের ভেজাল তেলযুক্ত খাবারে তো আপনার পেটে অসুখ হবার কথা।'

'পেটের অসুখ তো আছেই। তবে মনের অসুখ প্রকট। এ পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। যতদিন টিকে যেতে পারি সেই চেষ্টাই করছি। তবে যে কোনো সময়

বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠলে আমার কোনো আপত্তি নেই। জীবনের মতো বেঁচে যাই। আমি সব সময়ই প্রস্তুত।' মুর্তজা খেদোক্তি করলেন।

'এত ভেঙে পড়লে তো চলবে না, কষ্টকে নিয়েই সামনে এগিয়ে যান, একদিন সুদিন তো আসতেও পারে।'

'কেমন করে? 'যা হয়নি বিয়ের রাত্রি, তা হবে আবার আশ্বিন কার্তিক'? এটা আমি বিশ্বাস করিনে। জীবনের শুরুতেই আমার ভাগ্যে বিপর্যয় শুরু হয়েছে। এটা থেকে কোনোদিনই বেরোতে পারিনি। তাই সুখের সন্ধান কোনো দিনই পাইনি। এ আশা আর করিওনে। তবে আমি বেশ শক্ত ধাতের মানুষ। ভাঙি কিন্তু মচকাই না। যুদ্ধ করে সামনে চলি। সুখ করার জন্য আমি বাঁচিনে। সুখের আশা কখনো করিনে। যতটুকু পারি দুঃখকে জয় করতে চাই। এখন জীবনের প্রান্তসীমায় চলে এসেছি। যে কোনো সময় সরে পড়তে পারি, আবার এভাবে পনেরো-বিশ বছর পারও করে দিতে পারি। ভবিষ্যৎই কী হবে, বলে দেবে।'

'ভেঙে না পড়ে আল্লাহর উপর ভরসা করুন।' সেতু সান্ত্বনা দিতে চাইল।

'তুমি খোদাভীরু বলে আমাকে ধর্মের কথা শোনাতে পারো, এ অধিকার তোমার আছে। আমি কোনোদিন কিছু চেয়ে নিয়ে তৃপ্তি পাইনে, তাই বেহেস্তও কোনোদিন চাইনে। আমাকে ভালো রাখুক এ দোয়াও করিনে। শুধু তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তার দেওয়া কর্তব্যের কিছু অংশ পালন করার চেষ্টা করি মাত্র।'

'আপনার মতো লোকের ভালো থাকার কথা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঘাত পেয়ে আপনার মনটা হয়তো ভেঙে গেছে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার জন্য ভালো দিন অপেক্ষা করছে।'

'ভালো দিনের অপেক্ষা আমি আর করিনে। প্রথম জীবনে তোমাদের নিয়ে অনেক আশা করেছিলাম। আপন করেও নিয়েছিলাম। কোথা থেকে একটা দমকা ঝড়ো হাওয়া এসে আশার আলো একেবারে নিভিয়ে দিলো। তোমরাও আশাহত হলে, আমাকে ভুল বুঝলে। আমিও আসল কথা এ জীবনে কাউকে বলতে পারিনি। বলতে চাইওনি। জীবনের অনেক কথাই বলা যায় না। কথা যে বলতে পারে, তার কথাই সবাই শোনে ও বিশ্বাস করে।'

'আমাকে বলতে পারেন। আমি পেটে রাখবো। আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করতে পারেন। আমি সঠিক কথাটা আপনাকে বলবো। এ বিষয়ে আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। আমি গরিব হতে পারি কিন্তু কথার বরখেলাপ কোনোদিনই করবো না। আমার এক পা কবরে। আমার পাওয়ার কিছু নেই।'

‘আমারও বিশ্বাস, তোমার কথা ও কাজ এক। তুমি তো সেই কৈশোর বয়স থেকেই একটা ধার্মিক ভাব মনের মধ্যে ধরে রাখতে।’

‘কিন্তু একটা জিনিস আমার অপূর্ণ থেকে গেল, দাদা। ইচ্ছে ছিল জীবনে হজে যাব। মরতে বসেছি, তবু হজে যেতে পারলাম না। সংসারের টানাটানিই ফুরায় না। আপনার দুলাভাই তিন বছর পর অবসরে যাবে। টাকা পেলে এবং আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে দু জনে হজে যাবার নিয়ত করেছি।’

‘আল্লাহ তোমাদের নিয়ত পূরণ করবে নিশ্চয়ই।’

‘ভালো দিনের অপেক্ষায় আছি।’

‘তোমার বড় আপার অবস্থা কেমন? কোথায়, কী অবস্থায় আছে? ছেলেমেয়ে কয়টা? তোমার দুলাভাই কী করেন?’

‘আপা তো অনেক ভালো অবস্থানে আছে। আপনি তো জানেন, আপার যশোর শহরে দড়াটানা রোডে বিয়ে হয়েছিল। দুলাভাইয়ের এখন রমরমা অবস্থা। শহরের সবাই একনামে চেনে। দড়াটানা রোডেই বিশাল ছয় তলা বাগানবাড়ি। শহরের নামকরা কন্ট্রাক্টর, সরকারি মাল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আছে। ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা, স্থানীয় টেরাকোটার ব্যবসাও আছে। রাজনীতির স্থানীয় নেতা। রাজনীতি ও ব্যবসাকে মিশিয়ে ফেলেছেন। শহরে বেশ প্রভাবশালী। রাতকে দিন, দিনকে রাত বললেও কেউ বলার নেই। আপার এক ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলেটা ঢাকায় থাকে। দুলাভাই পরিশ্রমী ও টাকাপাগল মানুষ। রাজনীতিকে কীভাবে ব্যবসার কাজে লাগাতে হয় তা জানেন। টাকা দিয়ে মানুষকে কীভাবে বশে আনতে হয় তাও জানেন। খুব ধীর-স্থির স্বভাবের লোক। দুলাভাই ব্যবসার সাথে রাজনীতির সম্পর্ক মেলাতে পেরে অল্প কয়েক বছরেই ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন। এখন শত শত কোটি টাকার মালিক।’

‘আমাকে আর না বললেও চলবে। এ দেশের সব জায়গায় লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক-ব্যবসায়ী কিংবা ব্যবসায়ী-রাজনীতিকের বর্তমান অবস্থা দেখে বাস্তবতার বাকিটুকু বুঝে নিতে পেরেছি। যা হোক, তিনি ব্যবসা-রাজনীতি ও দুর্নীতিকে একই ডোরে বাঁধতে পেরেছে, এই তো?’

‘তবে যতটুকু দূর থেকে শুনি ও দেখি, শহরের অধিকাংশ কর্মকর্তা ও বড় বড় নেতা দুলাভাইয়ের ডান হাত-বাম হাত। তারা দুলাভাইয়ের মুরিদ। টাকায় কী না হয়! অনেক মাল সাপ্লাই ও কন্সট্রাকশনের কাজ তিনিই ম্যানেজ করেন।’

‘তোমার দুলাভাইয়ের নাম কী?’

‘হাজি কেরামত সরকার।’

‘আগেও কি সরকার পদবি ছিল? আমি তাকে চিনতে পারছিনে কেন?’

‘না, বাপ-দাদার আগের পদবি আমার জানা নেই। বর্তমানে সবাই কেরামত সরকার নামেই ডাকে। আসলে সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে উনি এই উন্নতি করেছেন, তাই সবাই নামের শেষে সরকার পদবি দিয়েছে। উনি সত্যিই কেরামতি জানেন। কী যেন কীভাবে কর্মকর্তা ও দলীয় নেতাদের অতি সহজেই বশ করে ফেলতে পারেন।’

‘তোমার আপার নামটাও কি আগের নামই আছে, না কি বদল হয়েছে?’

‘না, আগেরটাই আছে, তবে নামের শেষে সরকার যোগ হয়েছে। এখন সবাই স্বপ্না সরকার বলে। আপাও নামের সাথে দুলাভাইয়ের সরকার পদবি যোগ করতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত ভাবে।’

‘তো তোমার দুলাভাইয়ের এত টাকা থাকতেও তোমরা হজ করতে যেতে পারছো না কেন?’

‘দুলাভাই তিন বার হজ করেছেন। বাপ-মার নামে বদলি হজও করিয়েছেন। তাঁর টাকা নিয়ে হজে যেতে আমার ইচ্ছে নেই। তিনি ওমরাহও করেন। অনেক দান-খয়রাতও করেন। আমরা হজে গেলে আমাদের টাকাতেই যাব। আমাদের জন্য সেই দোয়া করবেন।’

‘আচ্ছা, ও প্রথমবার হজ থেকে আসার পর স্বভাবের কোনো পরিবর্তন কি তোমার চোখে ধরা পড়েছে?’
‘হ্যাঁ, আগে নামাজ কাজা যেত, এখন আর নামাজ কাজা করেন না।’
‘অন্য আর কিছু?’
‘দাড়ি রেখেছেন।’
‘আর কিছু? যেমন– ব্যবসার পরিবর্তন আনা।’

‘কই, না তো! ব্যবসা ও রাজনীতি তো পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। তিন-তিনটে ম্যানেজার, দুজন ইঞ্জিনিয়ার, বেশ কজন কর্মচারী। অনেক কাজই ম্যানেজারদের দিয়ে করান।’

‘আচ্ছা, হজে যাবার আগে কি অবৈধভাবে অর্জিত সব সম্পদ গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল?’

‘কই, না তো!’

‘প্রতি বছরই দেখি এদেশ থেকে যাওয়া হাজির সংখ্যা বাড়ছে। আমার মনে হয়, অনেকেই রাজনীতিকে ব্যবসার সাথে গুলিয়ে ফেলার মতো হজকেও ব্যবসা ও রাজনীতির সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। এটাকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছে,

সামাজিক ও মানসিক তৃপ্তি পাচ্ছে। চরিত্রকে বদল করছে না। আসলে কথায় আছে না 'খাসলত না যায় ম'লে, আর ইল্লত না যায় ধুলে'। হজই বলো, ওমরাই বলো, আর নামাজই বলো— ওদের অবৈধ রোজগার, দুর্নীতি, ঘুষের লেনদেন ও কপট স্বভাবের কোনো পরিবর্তন আনতে পারছে না। ওদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে গলদ রয়ে গেছে, চিন্তা বিকৃত হয়ে গেছে। তার রুজি কি বৈধ? তার হাত ও মুখ থেকে কি সাধারণ মানুষ নিরাপদ? তা না-হলে তার ইবাদত কবুল হয় কী করে? আমরা ইসলামের মূলনীতির সাথে বর্তমানে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ব্যবসা ও মানুষ ঠকানো তরিকাকে একসাথে গুলিয়ে একাকার করে ফেলেছি বলে আমার মনে হয়। আমি তো ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত নই। আমার ইসলামি জ্ঞানের দৌড় মসজিদের ইমামদের কাছ থেকে শোনা বক্তৃতা পর্যন্ত। তোমাদের সাথে তোমার দুলাভাই ও বড় আপার সম্পর্ক কেমন?'

'সম্পর্ক খারাপ বলা যাবে না। তবে যোগাযোগটা কম। দূরে দূরে থাকি। আমাদের পরিচয় দিতেও হয়তো তাদের লজ্জা করে। তাদের মনেও সব সময় একটা ভয় কাজ করে, কী জানি কখন কোনো টাকাপয়সা চেয়ে ফেলি! আবার যে কোনো বিপদে কাজে লাগতে পারে, তাই উপেক্ষিত হয়েও পিছ পিছ ঘুরি। সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। দুলাভাইয়ের অঢেল সম্পদ ও হজের গর্বে বড় আপা মনে মনে খুব গর্বিত। তাঁকে খুব পুতপবিত্র মানুষ ভাবে। দুলাভাইয়ের আয়-রোজগারকেও পুরোদমে সাপোর্ট করে। মাঝে মাঝে গল্প করলে বোঝা যায়। আমি চুপ থাকি। আপা দুলাভাইয়ের গুণগানে পঞ্চমুখ। তবে সম্পদ ও সম্পত্তিজনিত কারণে, এসব ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে আপা ও দুলাভাইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝেই মনোমালিন্য হয়। সেটা সাময়িক। আপার অভিযোগ, দুলাভাই সম্পত্তিজনিত বিষয়ে আপার মতামতকে আদৌ গণ্য করেন না। নিজের ভাই-ভাতিজাকে গুরুত্ব দেন। আপার সেটা পছন্দ নয়। দুলাভাই খুব সংসারী ও বৈষয়িক মানুষ। আপা গল্প করে, তার কপালগুণে এ সংসারে পা দেওয়ার পর থেকেই সংসারের উন্নতি শুরু হয়েছে। আপার বিশ্বাস, আপা খুব লক্ষ্মীকপালী। তবে আপনি তো জানেন, আপা নিজের বিষয় ছাড়া অন্যের কোনো বিষয় আদপেও আমলে নিতে চায় না। আপা বরাবরই হাড়কিপটে মানুষ। তার হাত গলিয়ে একটা পয়সা বাইরে বেরোনো খুব কঠিন। অন্যের প্রয়োজনকে কোনোভাবেই গুরুত্ব দিতে চায় না, ভাবতেও চায় না। একজন অসুস্থতার কথা বললে প্রত্যুত্তরে কোনো সহানুভূতির কথা না বলে সে নিজেই আরো বেশি অসুস্থ— সেটাই বেশি করে শোনাতে থাকে। স্বার্থের ব্যাপারে খুব সচেতন। অন্যের বিষয় ও অবস্থা নিয়ে ভাবতে সে অভ্যস্ত না। কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখেও না, ভাবেও না। মায়া-মমতা একটু কম এবং ক্ষণস্থায়ী। মাথার মধ্যে সে কী ভাবে তা জানিনে, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই মনে একটা বুঝ নিয়ে

মমতা কাটিয়ে ফেলতে পারে, যে কাউকে ভুলে যেতে পারে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। এটা তার বড় একটা গুণ। হাসিখুশি ও উচ্ছলতায় ভরা আত্মকেন্দ্রিক এক মহিলা।'

'বিভিন্ন জনের স্বভাব বিভিন্ন রকম হবে, এটাই স্বাভাবিক। হাজি কেরামতের পরিবেশ এবং অঢেল টাকাপয়সার লোভ তার সুস্থ চিন্তার পথে বাধা হয়েছে। তাই হাজি কেরামতের উপার্জনকে সাপোর্ট করতে শিখেছে। মানুষ তার স্বার্থের পক্ষে যুক্তি দেখাতে সব সময় পছন্দ করে। তবে সে তো আগে থেকেই বেশ বৈষয়িক ছিল। আমি প্রথম জীবন থেকেই তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তখন তাকে অত গভীরভাবে চিনিনি। কাঁচা মনের উচ্ছলতায় শুধু ভালোবেসে গেছি। জীবনের বাস্তবতা তখন কিছুই বুঝিনি, ভাবিওনি। তার প্রতি আমার দুর্বলতাকেই বড় করে দেখেছি। তার চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তখন 'আমি বাহির থেকে চোখ মেলেছি, ভিতর পানে চাইনি।' সে আমার মনে চিরজাগরূক। তার প্রতি আমার মানসিক এ দুর্বলতা কোনোদিনই ফেরত নিতে পারবো না, তা যত দূরেই থাকি। সে যেমনই হোক, আমৃত্যু তাকে দূর থেকে ভালোবেসে যাব, তার সুখ ও মঙ্গল কামনা করে যাব। সে সুখে থাকলেই আমি সুখী। তোমাদের মধ্যে আলাপচারিতায় কখনো কি আমার কথা ওঠে?' মুর্তজা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নিজের বিষয় উঠালেন।

'ওঠে, তবে খুব কম। আমাদের পরিবারের সবাই আপনার বিষয়ে আলোচনা হলেই সেদিকে কান খাড়া করে। সবাই আপনাকে আলাদা চোখে দেখে। আপা অন্যদের সামনে আপনাকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করে না। এড়িয়ে যায়। আমার সাথে কখনো সম্ভব হলে কিছু কথা বলে। মনে হয়, আপা আপনাকে এখনো ভালোবাসে। তার প্রতিজ্ঞা সে আপনার সাথে জীবনে কখনো কথা বলবে না। আপনি নাকি তার সাথে মিথ্যা বলেছেন। তাকে ফাঁকি দিয়েছেন। তার ভাষায়, আপনি একজন প্রতারক। কখনো হঠাৎ দেখা হলে আপনাকে কতগুলো কথা শুনিয়ে দেবে, এই তার ইচ্ছে। আপনার কি তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে?'

'সে আমাকে বেশি ভালোবাসে বলেই হয়তো এরকম প্রতিজ্ঞা করেছে। এতে আমি কিছু মনে করিনি। আমি শুনেছি সে সংসারজীবনে ভালো আছে, সুখে আছে। আমি তার সুখের ছন্দে তাল কেটে দিতে যাব কেন? আজ থেকে কমপক্ষে পনেরো বছর আগে এদেশে মোবাইল ফোনের ব্যবহার চালু হয়েছে। শুনেছি, আমার এক পরিচিতজনের কাছ থেকে তোমার আপা আমার ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছিল। ভেবেছিলাম, কোনো প্রয়োজনে হয়তো ফোন করবে। ফোন করেনি। তার আগ্রহ না থাকলে আমার ফোন করাটা উচিত হবে না। তাছাড়া, অন্যের স্ত্রীকে কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে ফোন করাটা আমার বিবেকবিরুদ্ধ। আমার ফোন করাটা সে

খারাপভাবেও নিতে পারে। সে যদি বলে, তুমি ফোন করেছো কেন? কোন অধিকারে তুমি ফোন করেছো? তখন আমি কী উত্তর দেব?'

'আপার নিজেরও অবশ্য কোনো ফোন নম্বর নেই। বাসায় টিঅ্যান্ডটি নম্বর এবং আরেকটা সাধারণ মোবাইল ফোন আছে, সেটা দুলাভাইসহ সবাই ধরে।'

'যা হোক, ফোন করার বিষয়টা এখন থাক। সে ভালো আছে শুনলেই আমার ভালো লাগে। জীবনে সবাই সুখী হতে চায়, কিন্তু সবারই পরিণতি এক রকম হয় না। আমার পারিণতি আমি জানি। ও-নিয়ে আমি ভাবিনে। তুমি তোমার শরীরের দিকে তাকাও। শরীরের যত্ন নাও। তুমি সরে পড়লে শুধু তুমিই যাবে, আর ছেলেমেয়ে দুটো কষ্ট পাবে। আমার সাথে তোমার যে ফোনালাপ, কাউকে বলার দরকার নেই। যখন ইচ্ছে ফোন কোরো। আমিও ফোন করবো। আর তুমি যেহেতু ধার্মিক মেয়ে, তোমার সাথে ধর্ম-কর্ম নিয়ে অনেক কথা বলা যাবে। তবে একটা উপদেশ আজ তোমাকে দিয়ে রাখি। হজ করতে যেতে চাচ্ছো, চেষ্টা করো। কিন্তু একটা জিনিস চিরসত্য বলে জেনো, গরিব হয়েছো বলে মনটাকে ছোট কোরো না। সব সময় বাড়িতে সুশিক্ষার পরিবেশ সুনিশ্চিত করবে। ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজে যতটুকু সাধ্য বিনিয়োগ করবে। তাদেরকে কাছে নিয়ে ভালো ব্যবহার করবে। ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করবে, সদুপদেশ দেবে। দেখবে অনেক ধনী লোকের তুলনায় ওরাই তোমাদেরকে, তোমার পরিবারকে অনেক উপরে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। ওরাই তোমার বড় সম্পদ। ছেলেমেয়েকে সম্পদ ভাবতে শেখো। এ সম্পদের উন্নতি মানেই তোমাদের উন্নতি, জীবনের উন্নতি, বংশের উন্নতি। এটাও কিন্তু একটা ধর্মপালন। বাস্তবতার দিকে একবার গভীরভাবে তাকিয়ে দেখো, সুশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার অভাবে অনেক নামকরা বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এদেশের অনেক গরিব, অখ্যাত মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবার তাদের সন্তানসন্ততিকে মানুষের মতো মানুষ করে, সুশিক্ষা দিয়ে পরিবারকে একটা উন্নতির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ধনী পরিবারের সন্তানসন্ততি বখে যায়। সুশিক্ষা শেখে না। তাদের বাপ-মায়েরও ছেলেমেয়েদের দিকে তাকানোর সময় নেই। বাপ অবৈধ পথে টাকা কামাতে ব্যস্ত, আর ছেলেমেয়ে খারাপ পথে টাকা উড়াতে ব্যস্ত। খারাপসঙ্গে মিশে যায়। পরিবেশ দূষিত করে। শেষে অমানুষ হয়ে সমাজে টিকে থাকে। শিক্ষার অভাবে বাপের টাকার সদ্ব্যবহার করতে জানেও না, পারেও না। নিম্নমানের পরিবেশে মিশতে থাকে। ইতোমধ্যে বাপ-মাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ। কথাগুলো ভুলো না। ভালো থাকো। পরে কথা হবে।'

মুর্তজা একটা জিনিস লক্ষ করেছেন, সেতু আগে তাঁকে রসিকতা করে 'দাদাবাবু' বলে ডাকতো। সেদিন স্টেশনে দেখা হবার পর দেখলো তাকে 'দাদা' বলে সম্বোধন

করছে। স্বপ্নভঙ্গ হবার পর থেকেই হয়তো শব্দটা ছোট করে ফেলেছে। সেতু তখনও কথায় ও চলায় শান্তশিষ্ট ও সরল স্বভাবের মেয়ে ছিল, এখনো সে-রকমটিই আছে। অথচ যত বিপদ তারই ঘাড়ে। দারিদ্র্যের বোঝাও তারই মাথায়। দেশীয় প্রকৃতির টেকসই উন্নয়নমুখী রাজনৈতিক খেলাধুলা বোঝা বড় দায়। এটা এদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবঞ্চনা। তার দুলাভাইয়ের মতো লক্ষ লক্ষ প্রবঞ্চক ও শোষক রাজনীতির ছায়াতলে কৌশলে তাদেরকে প্রচ্ছন্নভাবে শোষণ করছে। অনুকূল বাতাসে সেতুদের সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে, ধনী হচ্ছে। যাদের দেখার দায়িত্ব, তারা বরং এদেরকে আরো লুটপাটের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে।

৩.

সেতুর সাথে ফোনালাপ শেষে ফোনটা রাখার পর থেকেই মুর্তজা অস্থিরতায় ভুগছেন। বিছানায় হাত-পা মেলে দিয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলেন। ভালো লাগলো না। ততক্ষণে সন্ধ্যা লেগে গেছে। চেয়ারটা রুমের বাইরে বের করে ছাদে বসে কিছুক্ষণ খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যাতারাটা খুঁজতে লাগলেন। ওঁর স্বভাবটাই এরকম। একটা কিছু মাথার মধ্যে ঢুকলে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারেন না। অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। রাত বারোটায় আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করলে কোন দোকান খোলা আছে, খুঁজে বের করেন। আইসক্রিম কেনেন। তারপর সেটা খেয়ে তবে রক্ষে। কয়েক বছর থেকে অবশ্য এগুলো বাদ দিয়েছেন। কিছু খেতে ইচ্ছে হলে মনটাকে কষ্ট করে দমন করেন। ছেলেমেয়েকে খাওয়ানোর কথা মনে হয়। তিনি নিজের পাশে বসিয়ে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। তারপর নিজে খেতেন, এখন কিছু খেতে গেলেই ছেলেমেয়ের মুখচ্ছবি মনে ভেসে ওঠে। নিজে কিছু কেনেনও না, খানও না। নিজেকে বঞ্চিত করেন। তাঁর এই অস্থিরতা নিয়ে ছোটোবেলায় তাঁর মা অনেক কথাই বলতেন। কখনো বিরক্ত হয়ে পিঠে কিল মেরে বলতেন, 'তোর পিঠের শিরদাঁড়ায় বাঁদরের হাড় লাগানো আছে। তুই স্থির হয়ে বসবি কী করে?' বড় হলে ডাক্তাররা অবশ্য অন্য কথা বলেন। বলেন, 'আপনি হাইপার-টেনশনের রোগী।' এতে মুর্তজা নির্বিকার। তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। যে কোনো চিন্তা মাথায় ঢুকলেই অস্থিরতা বাড়ে, রাতের ঘুম হারাম হয়। ছাদে চেয়ারে বসে রাত কাটে।

সেতুর অসুস্থতা, সেতু ও তার স্বামীর সততা, অবসরের পাওনা টাকায় হজের ইচ্ছে, দেশের আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ততার নতুন নতুন কৌশল তাঁর মাথাটাকে আজ

ক্ষেপিয়ে তুলেছে। যে বাসায় মুর্তজার ছেলেমেয়ে ও সালেহা এখনো বাস করছে, সেখানে মুর্তজাও দীর্ঘ বছর পরিবারের সাথে থেকেছেন। পাশেই একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলো, নাম সুরুজ আলী। বাড়ির কাজ আধাআধি শেষ হলেই তাজুল নামের একজন প্লাম্বিং মিস্ত্রী কাজ করতে এলো। মুর্তজা কলেজের পথে বেরোতেই তাজুল তাকে প্রায়ই সালাম দিত। একদিন তাজুল মুর্তজাকে একাকী পেয়ে বললো, 'স্যার, সবই ঘুষের টাকা, এটা আমরা বুঝি। পেটের দায়ে এখানে কাজ করি, কিন্তু লোকটাকে খুব ঘৃণা করি।' মুর্তজা তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে পা সামনে বাড়ালেন। বুঝলেন, ঘুষখোরকে সামনে কিছু না বললেও অনেকেই মনে মনে ঘৃণা করে। তিনি ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছেন, অবৈধ উপার্জনকারীকে সমাজের লোকেরা মনে মনে খারাপ জানে, ঘৃণা করে, হেয় প্রতিপন্ন করে।

সুরুজ আলীর বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। সুরুজ আলী বাড়িতে শানশওকতের সাথে বসবাস শুরু করলেন। স্থানীয় মসজিদে বড় অংকের টাকা সবার সামনে দান-খয়রাত করতে থাকলেন। মসজিদের ফ্যানের সংখ্যা বাড়লো, দেয়াল ও মেঝেতে দামী টাইলস ফিটিং হলো। সুরুজ আলী সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন। মহল্লার অনেকেই তাঁকে সালাম দেয়। সব কিছুই মুর্তজা দিনে দিনে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।

ঘটনার আট-নয় বছর পরের কথা। একদিন মুর্তজা দেখলেন, তাজুল সুরুজ আলীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বসে অনেকক্ষণ গল্প করছে। মাঝে মধ্যেই দুজনকে গল্প করতে দেখেন। তাজুল সুরুজ আলীর পিছ পিছ বেড়ায়। মুর্তজার মাথায় চিন্তা ঢুকলো। একদিন তাজুলকে একাকী পেয়ে মুর্তজা জিজ্ঞেস করলেন, 'সুরুজ আলী তো খুব মিশুক লোক। তোমার সাথেও তো দেখছি সম্পর্ক ভালো। তুমি তাঁর সাথে ওঠা-বসা করো, তা কোনো নতুন কাজের পরিকল্পনা করছো নাকি?'

তাজুল বললো, 'না স্যার, ওনার অনেক টাকা আছে। টাকাগুলো কীভাবে আসে তা-ও আমি জানি। কিন্তু কাছাকাছি থাকলে, বার বার সালাম দিলে কোনো-না-কোনোভাবে ঐ টাকার একটা অংশ আমার হাতে চলে আসে। আমি ভালো থাকতে পারি। দূরে থেকে কোনো লাভ নেই।'

মুর্তজা কোনো কথা না বলে বাসার ভিতরে ঢুকলেন, তাজুলের মানসিক ভাবধারার পরিবর্তনের কথা ভাবলেন। সুরুজ আলীর প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে তাজুলের স্বার্থজনিত শ্রদ্ধা ফিরে এসেছে— এটাও বুঝলেন। বুঝলেন, এটা সামাজিক ভাবধারার পরিবর্তন।

সমাজের অনেক মানুষই অন্যায়টাকে আর অন্যায় বলে মনে করছে না। বরং অবৈধ উপার্জনকারীর সহযোগিতায় এগিয়ে এসে নিজেও সে-দলে শামিল হচ্ছে এবং সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। বৈধ-অবৈধ বিষয়টাকে আর বিবেচনায় আনছে না।

মুর্তজার ব্যক্তিগত জীবনেও এটা লক্ষ করেছেন। বিয়ের পর শ্বশুরকুলের কিছু আত্মীয় প্রথম দিকে বাসায় এসে থাকতো। কিছুদিনের মধ্যেই তারা ঢাকায় এলে এ-বাড়িতে দু-এক ঘণ্টার জন্য দেখা করতে আসে। ঢাকায় এসে ওঠে অন্য এক আত্মীয় বাড়িতে। আত্মীয় 'জুনিয়র সাব-এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার'। বড় বাড়িতে বাস করে। ঘর আসবাবপত্রে ভরা। নামী-দামী খাবারের আয়োজন হয়। আপ্যায়নও ভালো হয়। সে-গল্প মুর্তজার বাসায় এসে তারা করে। মুর্তজার ঘরে কাঠের চেয়ার, ফ্রিজ-টেলিভিশন নেই। ভালো না-লাগারই কথা। যদিও 'জুনিয়র সাব-এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার', চাকরির শেষ বয়সে এসেও একজন কলেজশিক্ষকের সমমর্যাদার পদে যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যেহেতু টাকা কামাই বেশি করার যোগ্যতা আছে, তাই আত্মীয়স্বজনের কাছে তার কদর বেশি। আয়-রোজগার কোথা থেকে কীভাবে আসে এটার বিবেচনা কেউ করে না। টাকা আছে তাই দামী সম্মানীয় লোক। যত প্রশংসা তার প্রাপ্য। এটা সমাজের অধুনা মানসিকতা। দুদক দুর্নীতি দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' বলে পাকড়াও করছে। কিন্তু মনে মনে সামাজিক বুনন, সমাজে বসবাসরত মানুষের মানসিকতা যে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে সম্মান ও ভাগ আস্বাদনের দিকে ক্রমশই মত্ত হয়ে উঠছে, সেটা কি বিবেচনায় আনছে? আবার বিদ্যমান অবস্থায় দুর্নীতিবাজ নামে কম্বলের লোম বাছতে গেলে যে কম্বল উজাড় হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়, নিরপেক্ষভাবে কি লোম বাছার কাজ হচ্ছে? ফলে ঠগ বেছে গাঁ উজাড় না করার সিদ্ধান্তই ভালো। সেক্ষেত্রে 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম' গোছের টেকসই সহাবস্থান হিতকর। তাতে কর্তাভজনে পরিপূর্ণতা পায়।

মুর্তজার কাছে সুরুজ আলীর সামাজিক অবস্থানটা আদৌ ভালো লাগে না। সমাজ সুরুজ আলী গংকে ভালোভাবে গ্রহণ করছে। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। ধর্মীয় অনুভূতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। সবই গতিশীল সমাজে মানসিকতার পরিবর্তন।

মুর্তজার ভালো লাগা, না-লাগাতে সমাজের কী এসে যায়! এই ভালো না-লাগা মসজিদ পর্যন্ত গেছে। শুক্রবার এলেই মসজিদে সুরুজ আলীর সাথে মুর্তজার দেখা হয়। কখনো মুর্তজার কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে। মুর্তজা অস্বস্তিতে ভোগেন। তিনি যতই বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চান, মানসিকভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন না। বার

বার তাঁর দিকে, তাঁর কৃতকর্মের দিকে মন চলে যায়। মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়ে সালাম ফেরানোর পর দুদিকে তাকিয়ে দেখলেই মুর্তজার মনটা নিজের অজান্তেই আরো খারাপ হয়ে যায়। তিনি মনকে প্রবোধ দেন। কাজ হয় না। অজান্তেই মন আবার সেদিকে চলে যায়। কাতারের দুদিকে তাকালেই চোখে পড়ে কিছু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। বাকি অনেকেই এই মহল্লার। দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে মুর্তজা দেখছেন। মসজিদে তাঁর পাশে নামাজ পড়তেও দেখছেন, পাশাপাশি ঘুষের বাজারে শামিল হতেও দেখছেন, রাজনৈতিক চাঁদাবাজদের আড্ডাখানায়ও দেখছেন। রামদা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেও দেখছেন। মিথ্যা বলার মঞ্চেও দেখছেন। কাউকে কাউকে শুক্রবার এলেই মসজিদেও দেখছেন, আবার নেশার বাজারেও দেখছেন। মসজিদেও জায়গা পাওয়া যায় না, আবার খারাপ জায়গায় গিয়েও জায়গা পাওয়া যায় না। অনেকাংশ একই লোকে ভরা। প্রতিটা গ্রামে-গঞ্জে মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে, মসজিদে শানশওকত ও টাইলস ফিটিং বাড়ছে। সাথে মুসল্লির সংখ্যাও বাড়ছে। আবার দেশে নীতিহীন, দুর্নীতিবাজ ও কথা-খেলাপকারী মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। কাজকর্ম না দেখে শুধু লেবাস বা মুখের চটকদার কথার উপর ভরসা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুর্তজার মনে প্রশ্ন, তাহলে কি ইসলাম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, মানসিকতার সুচারু পরিবর্তন ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে সামাজিক রেওয়াজ ও আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়ে গেছে? নইলে কীভাবে এটা সম্ভব? মাঝেমধ্যে মুর্তজা ইমামের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। ইমাম সাহেব বলেন, নামাজ পড়তে পড়তে একসময় লোকটা ভালো হয়ে যাবে। মুর্তজার প্রশ্ন, সেই একসময়টা কবে? আমি তো এই মহল্লার অসংখ্য লোককে আঠারো-বিশ বছর ধরে দেখছি, মসজিদে নামাজও চালিয়ে যাচ্ছে, আবার যত প্রকার অপকর্ম-দুর্নীতি আছে তার পিছনে সজোরে দৌড়ে যাচ্ছে। নামাজ তো তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। নামাজ পড়তে হয় তাই পড়ছে, এটা অভ্যাস ও আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু কুকর্ম ছাড়ছে না। তাদের কাছে নামাজটা হয়ে গেছে একটা সামাজিক ফরমালিটিস।

মুর্তজা বলতে চায়, যে নামাজি প্রতি রাকাতে আল্লাহকে বলছে, 'তুমি আমাদের সরল ও সহজ পথ দেখাও। তাদের পথ, যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছো। তাদের পথ নয়, (যারা) অভিশপ্ত ও পথহারা হয়েছে।' বার বার বছরের পর বছর এ কথা বলার পরও প্রতিনিয়ত এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কীভাবে? অভিশপ্ত ও পথহারা হয় কীভাবে? নামাজ পড়াও শেষ, নামাজ থেকে উঠেই আবার সেই গরল ও বিপথে চলা। নিশ্চয়ই সে মুনাফেক (কপট, প্রবঞ্চক, ভণ্ড), প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী। খোদার সাথে আজীবন প্রবঞ্চনা করে যাচ্ছে। এ প্রবঞ্চনা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। নামাজের

সুরাগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মন্ত্র আওড়াচ্ছে, সালাম ফিরাচ্ছে, নামাজ শেষ আবার কুটিল পথ শুরু। আল্লাহর কাছে নামাজে কি প্রতিজ্ঞা করছে, তা মাথায়ই আসছে না, মনেও ভাবছে না। তাই নামাজ সমাজের অনেকের জীবনকেই পরিবর্তন করতে পারছে না। তাহলে, নামাজ পড়া আমরা প্রাকটিস করছি, নামাজের মধ্যে অন্য ভাষায় বলা কথাগুলোকে বাস্তব জীবনে ও কাজে প্রয়োগ করছিনে। প্রার্থনার কথাগুলোকে বাস্তবে চর্চা করছিনে। ইসলামকে সৎকর্ম ও ভালো চিন্তার পথ হিসেবে নিচ্ছিনে।

মনকে পরের দোষ ধরা থেকে ভালো পথে আনার জন্য মুর্তজা অবশেষে একটা পথ খুঁজে বের করেছেন। তিনি অন্য মসজিদে জুমার নামাজে যান, সেখানে সবাই অপরিচিত। মনকে বাগে আনার আর কোনো পথ তিনি খুঁজে পাননি। তবু খারাপ কথাগুলো, তাদের উপার্জন, তুলনামূলক বিষয়গুলো মনের অজান্তেই মনে আসে। কেন আসে উনি জানেন না। শত চেষ্টা করেও মন থেকে তাড়াতে পারেন না।

মুর্তজা দেখেছেন, এক সময় ইসলামি বক্তারা মানুষকে খারাপ কাজ করতে নিষেধ করতেন, দোজখের ভয় দেখাতেন। বর্তমানে অনেক কৌশলী বক্তা বিপদের ভয়ে কিংবা নেগেটিভ কথা অনেকেই শুনতে চায় না বলে পজিটিভিজমে বিশ্বাস এনেছেন। শুধু কিছু সাধারণ বয়ান এবং কোন কোন কাজে কত সওয়াব পাওয়া যায় তা বয়ান করে কেটে পড়েন। খারাপ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে যান না। খারাপ লোকগুলোকে ভালোপথে আনার চেষ্টা করেন না। অসুবিধাও আছে। উচিত কথা বলতে গেলে কখনো-বা মসজিদের সভাপতি সাহেব বা কোনো রাজনৈতিক মস্তান ইমামের কথায় বেঁকে বসে। শেষে ইমামের জীবন ও চাকরি নিয়ে টানাটানি বেঁধে যায়। তাই নামাজ চলছে, ইসলাম চলছে, পাশাপাশি যত দুরাচার সদম্ভে অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনে হজের ঘর তওয়াফ করে নিজেকে পবিত্র করার মতলব আটছে। মুর্তজা শুনেছেন, ইসলাম কর্মের ধর্ম, পরকালে আজীবনের কর্মের বিচার হবে। আমরা কুকর্মকে ছাড়ছিনে, ধর্মকে আঁকড়ে ধরছি। বেহেস্ত পাবার আশায় কর্ম ও সুচিন্তা ছেড়ে মুখস্থ নামাজ ও হজকে বেছে নিয়েছি। প্রথমে সজ্ঞানে কুকর্মকে এবং অবৈধ উপার্জনকে বেছে নিচ্ছি। তারপর ইহকালের সম্পদ অর্জন হবার পর, পরকালে নাজাতের জন্য সহজ পথ খুঁজে ফিরছি।

মুর্তজা বাস্তবেও তাই নিজ চোখে দেখছেন। তাঁর অসংখ্য পরিচিতজন, কিছু ঘুষখোর বন্ধু-বান্ধব প্রথমে ইহকালের সুখের জন্য সহায়-সম্পত্তির লোভে অবৈধভাবে কামাই রোজগার করেছে। তারপর শেষ বয়সে এসে নামাজ ধরেছে, দাড়ি রেখে টুপি মাথায়

দিয়ে, প্রয়োজনে অবৈধ টাকা দিয়ে হজ পালন করে এসে রাতের পর রাত আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে কান্নাকাটি করছে, কেউ-বা সংসার ছেড়ে মাসের পর মাস তবলিগের পথে কাটাচ্ছে। উদ্দেশ্য, 'ইহকাল ও পরকালে কামিয়াব' হওয়া। বেহেস্তে যেতে চায়। কিন্তু কাউকেই দেখলেন না, নিজের অতীত ভুল বুঝতে পেরে আত্মদহন থেকে মুক্তির জন্য অবৈধ উপায়ে অতীতে অর্জিত সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে, রক্ত পরিবর্তন করেছে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত রুজিতে তার রক্ত তৈরি হয়ে শরীরে মিশে গেছে। রক্তের প্রতিটি বিন্দু দূষিত হয়েছে। মুখের কথা মূল্যহীন। বার বার নামাজে প্রতিজ্ঞা করে প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে। এখনো অতীতের অবৈধ সম্পদ রুজির সাথে মিশছে, অথচ বিলিয়ে দিচ্ছে না। তার দোয়া কবুল হয় কী করে? এটা তো সাধারণ বুঝ। অবৈধ সম্পদ আঁকড়ে ধরে আছে। তারপরও মন মানে না, বিবেকের অব্যক্ত দংশনে রাতের পর রাত আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য বেহেস্ত গমন।

এই টানাপোড়েনের সংসারে সৎভাবে জীবনযাপন করেও সেতুর অবসরের টাকায় হজে যাবার ইচ্ছার কথা শুনে এবং তার দুলাভাইয়ের মতো লক্ষ লক্ষ কেরামত সরকারের আয়-উপার্জন, ধনী হবার তরিকা, হজের বহর ও সমাজে সম্মানিত লোকের তালিকায় স্থান করে নেওয়ার কেরামতি দেখে মুর্তজার মাথা আজ বিগড়ে গেছে, বেসামাল হয়ে গেছে— তাই এত কিছু ভাবছেন।

যারা প্রকৃত ধার্মিক তারা কেউ-বা জীবনের শেষ সম্বল ব্যয় করে হজের নিয়ত পূরণ করছে, কেউ-বা পেনশনের টাকা ব্যয় করে হজে যাবার নিয়ত করে বসে আছেন। আজীবন অনেক কষ্ট করেও সৎ-রুজি ও সত্যের উপর টিকে আছেন। সরল-সহজ পথকে জীবনের পাথেয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর হাজি কেরামত সরকার গংয়েরা অর্থাৎ বকধার্মিকেরা সেতু গংদের মতো সাধারণ মানুষের সরকারি বরাদ্দ কূট কৌশলে আত্মসাৎ করে বার বার হজ করে নিষ্পাপ শিশুর আকার ধারণ করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বংশের মৃত সবার নামে বদলা হজের ব্যবস্থা করাচ্ছে। সামনের কাতারে বসে নামাজ পড়ছে, সমাজের সালাম নিচ্ছে, মসজিদগুলো ও অজুখানা অবৈধ টাকায় টাইলস দিয়ে মোড়াচ্ছে। অথচ দেশে ক্রমশই সৎ ও বিবেকবান মানুষের বড্ড আকাল দেখা দিচ্ছে। বড় নামী-দামী ব্যক্তি হতে গিয়ে নামের পরে ডিগ্রি লিখতে না-পেরে নামের আগে 'হাজি' অথবা 'আলহাজ' শব্দটা লিখে নামটা যত বড় ও শ্রুতিমধুর করা যায় তা করে তুলছে। এভাবে পবিত্র হজ পর্বটাকেও একটা ফ্যাশনে পরিণত করেছে।

মুর্তজা অনেক নাস্তিককেও ইদানীং দলীয় সফরসঙ্গী হয়ে হজপর্ব সমাধা করতে দেখছেন, আবার ফিরে এসেই সেই মিথ্যাবাজি, দলবাজি, চাঁদাবাজি করে জীবন চালিয়ে যেতে দেখছেন। এসব ব্যক্তি পথ চলতে হোঁচট খেয়ে পশ্চিম দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেলেও, ওদিকে কাবাঘর বলে ইচ্ছে করেই উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে হেলে পড়েন, যাতে সেজদাটা পশ্চিম দিকে না হয়ে যায়। তবু রাজনীতি করতে গিয়ে হজ করতে হয়।

ইসলামি দল ও গ্রুপেরও অভাব নেই। যত গ্রুপ তত ভিন্নমত। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। বিভক্তিরও শেষ নেই। 'কেহ কারো নাহি ছাড়ে সমানে সমান'। ইসলামের অন্তর্নিহিত দর্শন ও জীবনব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে 'দোয়াল্লিন', এবং কে 'জোয়াল্লিন' উচ্চারণ করলো, কে 'আমিন' জোরে অথবা আস্তে বললো, তা নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করছি, আর মারামারি করে মরছি। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের নিজের স্বর্থের জন্য কাছে নিয়ে নিজের ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করছি। ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার চেষ্টা করছি। ইসলামের মতো বিশাল হাতির পুরো শরীরকে বাদ দিয়ে লেজের চুল দু-একটা বাঁকা না সোজা— তা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করছি, অথচ খোদ হাতির অজান্তেই এমন কতশত চুল ঝরে যাচ্ছে।

এ আজব জনগোষ্ঠীর মনোভাব বোঝা বেশ দুরূহ। এদের কথার গূঢ় অর্থ বোঝা আরো দুঃসাধ্য। সবই রাজনৈতিক হুজুরদের মোজেজা।

মুর্তজার আজ রাতের ঘুম হারাম হতে বসেছে। শেষে মাথায় ঢুকেছে স্বপ্নার পদবি 'সরকার' হরার কথা। মুর্তজাকে প্রতারক বলার কথা। দেখা হলে স্বপ্না কথা বলবে— কী বলবে না, এটা তার স্বাধীনতা। তবে দুকথা শুনিয়ে দেওয়ার মনোভাব তো ভালো না। এতে পথে-ঘাটে অপমানিত হবার বিষয়টা রয়ে যায়। সে-বিষয়ে মুর্তজাকে আগেই সাবধান হতে হবে। কারণ মেয়েদের সাথে তর্কে পারা কঠিন। আবার এড়িয়ে যাওয়াটাও সব সময় সহজ হয় না।

মুর্তজার মাথা থেকে স্বপ্নার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারছেন না। ক্রমশই স্বপ্নার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ছেন। যে তাঁকে ঘৃণা করে, তাকে মুর্তজার ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। এটা তাঁর প্রথম জীবনের দুর্বলতা। মুর্তজা স্বপ্নার অজ্ঞতাকে উদারতা দিয়ে দেখতে চায়। স্বপ্নার সাথে আবার যোগাযোগ কিংবা হঠাৎ দেখা হলে কি হতে পারে, সেটা নিয়ে তাঁর এ রাতের ভাবনা ও কল্পনা, স্বপ্নার স্বপ্ন।

৪.

সেতুর সাথে দেখা হওয়ার পর চার-পাঁচ মাস কেটে গেছে। এখন মাঝেমধ্যেই ফোনে কথা হয়। মুর্তজা অনেক দিন পর গ্রামের বাড়ি এসেছেন। ঢাকা ফিরে যাবেন। তিনি ব্যাগটা হাতে নিয়ে স্টেশনের প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের বিশ্রামাগারে গেলেন। ওখানে কেউ নেই। ট্রেন আসতে তখনো বিশ মিনিট বাকি। ত্রিশ সেকেন্ডও দাঁড়াতে পারলেন না। রুচিতেও নিলো না। এর বেশি সময় বিশ্রামাগারে থাকলে বমি চলে আসবে। মুর্তজার এ পথে যাতায়াত কম বলে বিশ্রামাগারের অবস্থার খোঁজ রাখেন না। রুমের সাথে সংলগ্ন বাথরুম। সামনের পুরো জায়গাজুড়ে পানের পিকে ভরা। টয়লেট থেকে বিশ্রি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। রুমের অন্যান্য অংশ আবর্জনা ও বাদামের খোসায় ভরপুর। মুর্তজা তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে ট্রেন আসার সময় গুনছেন।

ট্রেন প্রায় আসে আসে অবস্থা। কিছুদূরে ট্রেনের মাথা দেখা যাচ্ছে। ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠতে হবে। মুর্তজা সে-প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পাশের সাব-এসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের রুম থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন, চোখে কালো সানগ্লাস। পিছ পিছ এক ভদ্রলোক একটা ব্যাগ হাতে এগিয়ে আসছেন। মুর্তজা অতটা ভালো করে মহিলার দিকে তাকালেন না, ট্রেনের দিকে দৃষ্টি। যশোর স্টেশনে ট্রেন এসে গেল। মুর্তজা ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠে পড়লেন। মনে হলো মহিলা একই বগির অন্য দরজা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। তিনি না উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

প্রায় একশ গজ সামনে এসে ট্রেন আবার থেমে পড়লো। মুর্তজা তাঁর সিট খুঁজে বসার চেষ্টা করছেন। ব্যাগটা উপরে রাখলেন। তারপর জানালার ধারে বসলেন। আজ তাঁর ভাগ্যটা ভালো। জানালার ধারে বসে যেতে পারবেন। আরো তিন-চারশ গজ ট্রেনটা যেতে না যেতেই এক ভদ্রমহিলা তার সিটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সানগ্লাস দেখে মনে হলো সেই না-উঠতে-পারা ভদ্রমহিলা। মুর্তজা কালো ফ্রেমের পুরু গ্লাসের চশমা পরে আছেন।

'জানালার পাশের এ সিটটা কি আপনার সিট?' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, আমার।' গাম্ভীর্যের সাথে মুর্তজা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

'আপনার পাশের সিটটাই দেখছি আমার। আমি একটু অসুস্থ। আমি ঢাকায় যাব। আমার সাথে আর কেউ নেই। প্লিজ আমাকে কি জানালার ধারে কিছুক্ষণ বসার সুযোগ দেবেন?'

মুর্তজা 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলে উঠে পাশের সিটে বসলেন এবং মহিলাকে জানালার ধারে বসার সুযোগ করে দিলেন। হাতের ব্যাগটা উপরে উঠিয়ে দিলেন।

মুর্তজা ব্যাগটা উপরে উঠাচ্ছেন আর স্মৃতির পাতা উল্টাচ্ছেন। মনে মনে ভাবছেন, 'খুঁজে মরি এইক্ষণে স্মৃতির গহনে, কোথায় তোমায় যেন দেখেছি।' কেন জানি মহিলাকে তাঁর চেনা চেনা মনে হয়।

মহিলা মানুষ, তার দিকে ভালো করে বার বার তাকানোও যাচ্ছে না, আবার সানগ্লাস পরা অবস্থায় মুখটাকে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। দুজনে পাশাপাশি বসে আছেন। ট্রেন হুড়হুড় গতিতে সামনের দিকে ধেয়ে চলেছে। ভদ্রমহিলা মুর্তজাকে প্রশ্ন করলেন,
'আপনি কোথায় যাবেন?'
'ঢাকায়।'
'ওখানে আপনার কে থাকেন?'
'আমি নিজেই পরিবার নিয়ে সেখানে থাকি।'
'কত বছর থেকে?'
'প্রায় ত্রিশ বছর।'
'আপনার গ্রামের বাড়ি নিশ্চয়ই এই এলাকায়?'
'হ্যাঁ, এখান থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে। আমার এখন গ্রামে কেউ থাকে না, তাই এখন আর আসা হয় না বললেই চলে। আপনার ঢাকায় কে থাকেন?' মুর্তজা প্রশ্ন করলেন।

'ছেলে, তার বাসায় যাচ্ছি।'

'আপনারা স্থায়ীভাবে যশোরেই থাকেন?'

'হ্যাঁ, যশোরেই। এখানকার প্রায় সবাই আমাদেরকে এক নামে চেনে। আমার স্বামী এই শহরের একজন বড় কন্ট্রাক্টর।'

মুর্তজার প্রশ্ন করার ধরন, গলার স্বর ও মুখাকৃতি দেখে এবং বিশ মাইল দূরে বাড়ি শুনে ইতোমধ্যেই ভদ্রমহিলা চিনে ফেলেছেন যে ইনি মুর্তজা।

'আপনার স্বামীর নাম যেন কী?'
'স্বামীর নামের আগে আমার নাম শোনো, আমি সেই হতভাগী স্বপ্না। আমাকে চিনতে পারছো? ঐ লোকটার নাম হাজি কেরামত সরকার।' কথাটা বলে স্বপ্না সানগ্লাসটা খুললো, মুর্তজার দিকে তাকালো। মুর্তজা ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে নিজেকে সামলে নিলেন।

বললেন, 'চিনবো আর কেমন করে, তুমি তো অনেক বদলে গেছো। পঁয়ত্রিশ বছর পরে দেখা, আর তুমি তো আবার সানগ্লাস পরে আছো। তা বলো, কেমন আছো?'

'ভালো আছি' বলে হাসি মুখে স্বপ্না মুর্তজার দিকে আড় চোখে তাকালো। দুজনে চোখাচোখি হলো। মুর্তজার মনে ভেসে এলো, এ চোখ তো সেই শত শত বার দেখা চেনা-জানা কাজল কালো ডাগর দুটো চোখ। অবিকল সে-রকমই আছে। শরীর নষ্ট হয়ে গেছে। মুখশ্রীও বিবর্ণ হয়ে গেছে। গলা ও গলার নিচের চামড়াগুলো কেমন ঢিলা হয়ে একটু ঝুলে গেছে। যাকে নিয়ে এত স্বপ্ন, এত সাধনা, সে আজ পাশে থেকেও কত দূরে মনে হচ্ছে! ও-দুটো চোখের চাউনি কতবার দেখেও সাধ মিটতো না, আরো দেখতে ইচ্ছে করতো। কত আশা, কত ভাবনা সব বিফলে চলে গেছে। দুজনার জীবনধারা দুটি পৃথক স্রোতে বয়ে চলেছে। মুর্তজা আজ ক্ষুদ্র এক কলেজশিক্ষক, স্বপ্না ধনীর অর্ধাঙ্গিনী।

'তোমারও তো চেনার মতো নেই। সেই উন্নত বুক, সুডৌল স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল শ্যামলা চেহারা হারিয়ে কালো হয়ে গেছো। তোমার চুলও তো দুপাশ থেকে উঠে গেছে। সামনের চুল ফাঁকা ফাঁকা। চৈত্রের খরতাপে ঝলসানো যেন ক্লান্ত মুখখানা। বড্ড রোগা হয়ে গেছো। সে দিনগুলো কোথায় যে হারিয়ে গেল! এমনটি কেন হলো বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, পারি। কিন্তু জীবনের সব কথা বলা যায় না, সম্ভবও না। ওটা আজ নাই-বা শুনলে। জীবনের এই শেষবিকেলে এসে ওসব শুনে আর কী লাভ! ওসব কথা থাক। দুজনে এতটা সময় পাশাপাশি বসে কথা বলার সময় অতীতে কোনোদিনও আমাদের হয়নি। আজ সেই সুযোগ এসেছে। আমি আজকেও আসার সময় স্কুলের পিছনের সেই কুলগাছটার দিকে তাকালাম, সেই কুলগাছ কিন্তু এখন আর নেই, রয়ে গেছে আমাদের স্মৃতির মুকুরে। ঐ কুলগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে প্রায়ই কথা বলতাম, আর কেউ এসে পড়ে কী-না দু জোড়া চোখ তা পাহারা দিত।'

'তুমি আমাকে প্রথম চিঠিটা কীভাবে দিয়েছিলে মনে পড়ে?' স্বপ্না প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, আমরা তিন বন্ধু স্কুলে যেতাম। তোমরাও পাশের গ্রাম থেকে তিনজন একসাথে এসে এক রাস্তায় মিলিত হতে। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমি আমার এক বন্ধুকে বললাম, 'তুই যদি এই ছোট্ট কাগজটা স্বপ্নার হাতে দিয়ে আসতে পারিস, তোকে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াব।' সে বেট ধরলো, পারবে। দ্বিতীয় বন্ধু সাক্ষী। আমি চিঠিটা দেওয়ার পর সে সত্যি সত্যি তোমার হাতে দিয়ে এলো। যদিও চিঠিতে আমার নাম ছিল না। আমি জানতাম তুমি বুঝবে। কারণ বাকি দুই বন্ধু ছিল হিন্দু। তুমি প্রথম চিঠিটার উত্তরে কী লিখেছিলে মনে আছে?'

‘না, ঠিকমতো মনে নেই।’
‘আমার কিন্তু আছে, এখন বলা যাবে না, পরে বলবো। খুব ছেলেমোপনা ভাষা ছিল। সাথে চিঠির উত্তর চেয়েছিলে।’
‘প্রথম চিঠির পর থেকেই তুমি চিঠি লেখার প্যাডে লেখা শুরু করলে। কোনো প্যাডের এক কোণে ফুলের গাছে টোনাটুনি বসে থাকতো, আবার কোনো প্যাডে থাকতো শুধু গোলাপ ফুলের ছবি। আমি চিঠি লেখার প্যাড পরে কিনেছিলাম। তুমি আমাকে একটা সুন্দর নাম দিয়েছিলে। তুমিও ভিন্ন নামে লিখতে। নাম দুটো কি এখন বলতে পারবে?’ স্বপ্না মুর্তজার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।
‘আমারটা বলতে পারবো, তোমারটা এই মুহূর্তে মনে আসছে না।’
‘আমার মনে আছে। অথচ তুমি ভুলে গেছো।’
‘না, আমি তো তোমাকে বেশ কয়েকটা নামে ডাকতাম। তুমি কোনটা এখন মনে ভাবছো আমি জানি না। একবার বললেই মনে পড়বে। তোমার দুই ক্লাস নীচে পড়তো আমার চাচাতো বোন রাবেয়া, সে-ই ছিলো আমাদের ডাকপিয়ন। আমাদের চিঠি দেওয়া-নেওয়ার কাজে তাকে ব্যবহার করতাম।’
‘রাবেয়া খুব হাবাগোবা মেয়ে ছিল। আমাকে আপা বলে ডাকতো। মাঝে মাঝে ভাবী বলেও রসিকতা করতো। আমি ওকে খুব আদর করতাম। মাঝেমধ্যে চকলেট হাতে দিতাম।’
‘কত শ চিঠি দুজনে লিখেছি, তার কি কোনো হিসাব তোমার কাছে আছে? আর ঐ স্কুলের পিছনের কুলতলা। কত শ বার ওখানে দাঁড়িয়ে দুজনে অল্প সময়ের জন্য কথা বলেছি, আর একজন অন্য জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি, তারও কোনো হিসাব আমার কাছে নেই।’
‘তোমার চিঠির ভাষাগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর হতো। তুমি অনেক বড় করে চিঠি লিখতে। আমার চিঠির ভাষা ভালো হতো না। আবার অল্প কথায় চিঠি লিখতাম বলে তুমি বকা দিতে।’ বাতাসে কপালের সামনে উড়ে আসা চুলগুলো পিছনে দিতে দিতে স্বপ্না বললো।
‘সারারাত প্রায় ঘুমাতাম না। বার বার তোমার লেখা চিঠিগুলো পড়তাম। তবু তৃপ্তি মিটতো না। কবে তোমাকে পাব, শুধু সে চিন্তাই করতাম। আবার রাত জেগে তোমার কাছে বড় চিঠি লিখতাম। দিনগুলো স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। তোমার হাতে জীবনটা সঁপে দিয়ে তোমাকে নিয়ে স্বপ্নের ঘোরে দুজনে জীবনটা পার করে দিতে চেয়েছিলাম। কীভাবে যে সে-স্বপ্ন ভেঙে গেল বুঝতে পারিনি! স্বপ্নভঙ্গের বেদনা যারপরনাই কষ্টদায়ক। তা আমি আজীবন বয়ে বেড়াচ্ছি। বাকি জীবনে ভালো থাকলে কষ্টটা এতটা অনুভূত হয় না। নইলে আজীবন অব্যক্ত কষ্ট ও হতাশার ঘানি টেনে বেড়াতে হয়।’ মুর্তজার মুখে বিষণ্নতার চিহ্ন ফুটে উঠলো।

‘তুমি স্কুল ছেড়ে শহরে কলেজে চলে গেলে। তারপরও তিন-চার মাস যোগাযোগ ছিল। হঠাৎ রাবেয়া বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, স্কুলে আসাও বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।’ কথাগুলো বলে স্বপ্না একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

‘তারপরও আমি যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি। তুমি কতদিন চেষ্টা করেছো, তুমিই বলতে পারবে। তোমার হাতে তো যোগাযোগের একটা মাধ্যম ছিল বলে আমি জানতাম। তুমি সে মাধ্যম কাজে লাগাওনি বলে আমার মনে হয়।’ মুর্তজা বললেন।

‘তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না। আমিও অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।’

‘তুমি নাকি এর পরও নূরে আলম, তারপর কালিগঞ্জ থেকে আসা ঐ ছেলেটার কাছে চিঠি দিয়েছিলে? তোমাদের বাড়িতে নিয়মিত যেত এমন একজন আমাকে এসব তথ্য দিয়েছিল এবং আমাকে সে কসম করে বলেছিল। তাছাড়া আরো দুজন এ ধরনের তথ্য আমাকে দিয়েছিল। এতে আমার মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। নিজেকে ব্যর্থ ভেবেছিলাম। প্রথম জীবনের ব্যর্থতার প্রথম ধাক্কা সহ্য করা অনেক কঠিন। হতাশার কুয়াশা আমাকে পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছিল। আমি জীবনটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। আমার সেই দ্বিতীয় বন্ধুটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে রাতের পর রাত সান্ত্বনা দিত। সে-ই আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছিল।’

‘আমার এতটা মনে নেই, না দেওয়ারই কথা। তবে চিঠি লিখতে লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম তো, না লিখতে পারলে মনটা কেমন উসখুস করতো। সম্ভবত আমি কোনো চিঠি তাদেরকে লিখিনি। তোমার অবর্তমানে তারা আমাকে বরং বিরক্ত করতো। আমার পিছনে লেগেছিল।’

‘আচ্ছা, তারপর তো বাড়ি থেকে তোমার স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল, তাই না? স্কুলের পিছনের রাস্তা দিয়ে যেতে তোমাকে নিষেধ করতো। তারপরও তুমি যেতে।’

‘হ্যাঁ, অভিভাবকমহল আমাকে খুব বকাবকি করতো। একদিন মারও দিয়েছিল।’

‘আচ্ছা, রাফিজ ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কেমন সম্পর্ক ছিল? তুমি তো জানতে রাফিজ ভাই আমার আত্মীয়, তোমাদের গ্রামে বাড়ি। আমার বাল্যবেলার খেলার সাথী। বয়সে মাত্র এক বছরের বড়। আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতো। তখন তোমার সাথে আমার যোগাযোগ অনেক দিন থেকে নেই। রাফিজ ভাই জানতো যোগাযোগ আছে। একদিন রাফিজ ভাই ভরসন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে এলো। রাতে খাওয়ার পর দুজনে আমার বিছানায় শুতে গেলাম। সে তোমার কথা তুললো, তোমার লেখা

অনেকগুলো চিঠি ব্যাগ থেকে বের করে আমার সামনে বিছানায় রাখলো। আমাকে পড়ে দেখতে বললো। আমি অপ্রস্তুত হলাম। বড় ভাইয়ের কাছে লেখা চিঠি ছোট ভাই কীভাবে পড়ে! আমি চিঠিগুলো উঠিয়ে ব্যাগে রাখতে বললাম। মনটা খুব ভেঙে গেল। সারারাত ঘুম এলো না। অবিরাম ধারায় চোখের পানিতে সারারাত বালিশ ভিজতে থাকলো। রাফিজ ভাইকে কিছুই বললাম না। সকালে উঠে রাফিজ ভাই বাড়ি চলে গেল।'

মুর্তজার এ কথাতে স্বপ্না হতচকিত হলো। একটু নড়ে বসলো। তারপর বললো, 'রাফিজ ভাই আমাকে ভালোবাসতো তা আমি জানি, কিন্তু আমি তাকে দূরে সরে যেতে বলেছিলাম। আসলে ঐ চিঠিগুলো আমার লেখা না। আমার বান্ধবী সুজলা চিঠিগুলো লিখে দিত। আমি ওগুলো রাফিজ ভাইকে দিতাম। রাফিজ ভাই চিঠির উত্তর দিলে আমি ওগুলো বাড়িতে নিয়ে আসতাম। দুজনে পড়ে মজা করতাম।'

'তুমি কখনো কি রাফিজ ভাইকে বলেছিলে যে, ও চিঠি তোমার লেখা না, সুজলার লেখা?'

'না, তা বলিনি। এ ঘটনা তোমার সাথে সম্পর্কের আগের ঘটনা।' স্বপ্না উত্তর দিল।
'তাহলে রাফিজ ভাই কীভাবে বুঝবে যে, ঐ চিঠিগুলো তোমার হাতে লেখা না? তাছাড়া, তুমিই তাকে চিঠি দিচ্ছ, চিঠি নিচ্ছ, আনন্দ করছো, হাসছো। এ আবার কেমন মন নিয়ে খেলা? কেমন আত্মঘাতী তৃপ্তি? অথচ রাফিজ ভাই তোমাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছিল। আমাকেও তো তুমি এ কথা কোনোদিন বলোনি।'
'তখন এভাবে ভাবিনি। পরে বুঝেছিলাম।'
'এমনও তো হতে পারে তুমিই তোমার অজান্তে সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছো। অথচ অন্যকে দোষ দিয়ে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছো। কপালগুণে ভালো আছো বলে হয়তো অতীতকে ভুলে যেতে পেরেছো। না-পাওয়ার যন্ত্রণা বুঝতে শেখোনি। আমি এরপর অনেকবার তোমার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম, শুধু তোমার মতামত জানার জন্য। এটা একটা আত্মঘাতী খেলা, এটা কি তুমি কখনো ভেবে দেখেছো? এভাবে রাফিজ ভাইয়ের স্বাভাবিক জীবনটা তুমি শেষ করে দিয়েছিলে। সে বিপথে চলে যায়। তার নামে অনেক দুর্নাম রটে। সবাই তার চরিত্রের দুর্নাম দিত। ঘটনাগুলোও সত্য ছিল। সে মেয়েদেরকে খুব খারাপ চোখে দেখতো। এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে বাড়ির চাপে বাধ্য হয়ে বিয়ে করে। জীবনে কোনোদিন সুখী হতে পারেনি। অকালে ঝরে গেছে।'

'সেজন্য আমি দুঃখিত। এতো অল্প বয়সে আমি এভাবে ভাবিনি। রাফিজ ভাইয়ের কথা মনে হলে আমি এখনো বেশ কষ্ট পাই। তুমি দূরে থাকার সময় আমি একবার

ভেবেছিলাম যে, তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে আমি রাফিজ ভাইকেই বিয়ে করবো। কিন্তু কোনো কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি।'

'সেই থেকে আমিও নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে শিখেছি। ব্যর্থতার গ্লানি মানুষকে অন্তর্দগ্ধ করে। পুড়িয়ে অন্তরটাকে ছাইয়ে পরিণত করে। তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি পোড়ায়। কাউকে বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। না পাওয়ার বেদনা ও মানসিক অশান্তি এমন একটা জিনিস যা দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে জীবনটাকে পঙ্গু ও অন্তরটাকে খোলা করে ফেলে। আজীবন অতীতের সেই দুঃস্বপ্ন নিয়ে ব্যর্থতার মালা গেঁথে জীবনের বাকি অধ্যায়কে শেষ করে দিতে হয়। আমিও নিজেকে তোমার হাতের কুড়িয়ে পাওয়া একটা ফুল ভেবেছিলাম। চলতে পথে কুড়িয়ে নিয়েছিলে, আবার মনের অজান্তেই কখন হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলে, এটাই ভেবেছি। কুড়িয়ে পাওয়া ফুলকে কে মনে রাখে! তোমাকে হারিয়ে আমিও এলাকা ছেড়েছি, ভবঘুরে হয়েছি। কোনোদিন সংসারী হতে পারিনি। সংসারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। সংসার আমাকে কাছে টানে না। পিছলে পড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কোনোভাবে জীবন পার করছি, লেখাপড়া কোনোদিনই করিনি। টেনেটুনে এমএ পাস করেছিলাম। শুধু তোমাকে নিয়েই ভেবেছি। শেষে এলাকা ছেড়ে দূরে এক কলেজে শিক্ষকতা করে জীবন পার করছি। তোমাকে পেলে আমি এলাকা ছাড়তাম না। ইচ্ছে ছিল একটা ব্যবসা করে এলাকায় থাকার। জীবনের সব চাওয়া পাওয়া হয় না।'

'তোমার ছেলেমেয়ে কয়টা? তারা কী করে? তোমার সংসার জীবন কেমন চলছে?' স্বপ্না অন্য প্রসঙ্গে এলো।

'একটু বেশি বয়সে ঘর বেঁধেছিলাম, খুব বেশিদিন টেকেনি। দুটো ছেলেমেয়ে, ওরা ওদের মায়ের সাথে থাকে। ছেলেমেয়ে বড় হয়নি। এখনো লেখাপড়াই শেষ করতে পারেনি। আমি সংসার থেকে সেপারেটেড। ওদের ভরণপোষণের অর্থ বহন করি। আলাদাভাবে জীবনযাপন করি। নিজের মতো স্বাধীনভাবে চলি। আমার বিশ্বাস এভাবে আমি জীবনটা পার করে দিতে পারবো।'

'আমার খোঁজ খবর কি কখনো কারো মাধ্যমে নাও?'

'হ্যাঁ, নেয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু সব সময় সঠিক তথ্যটা পাওয়া যায় না। তুমি ভালো আছো, অনেক বিত্ত-বৈভবের মধ্যে আছো, জেনে আমার খুব ভালো লাগে। অন্তত আমার মতো একজন কলেজশিক্ষকের ঘরে গেলে তুমি নিশ্চিত এতো সুখী হতে পারতে না। তাছাড়া নিশ্চয়ই তুমি ভাগ্যবতী। আমার ঘরে গেলে তোমার গর্ব করার মতো কিছুই থাকতো না। একজন মিথ্যাবাদী এবং প্রতারককে নিয়ে কী গর্বই-বা তুমি করতে, বলো? বরং প্রতারকের ঘরে এলে মানুষের কাছে তোমার মাথা হেট হয়ে

যেত। সবাই বলতো, প্রতারকের স্ত্রী। তারচেয়ে অনেক ভালো আছো। সামাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছো। ধনী লোকের স্ত্রী হিসেবে সবাই তোমাকে সম্মানের চোখে দেখে, সালাম দেয়।'

'তুমি আমাকে এত কষ্ট দিয়ে কথা বলছো কেন? আমার বিশ্বাস ছিল তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছিলে। আসলে আমি তোমাকে ভালোবাসিনি তা নয়। তুমি যেমন যোগাযোগ করোনি বা করতে পারোনি, আমিও তেমন যোগাযোগ করতে পারিনি। তাই হয়তো আজকের এই অবস্থায় এসেছি। আমি আজও তোমাকে ভালোবাসি।'

'তুমি যে ধনীর ঘরে জীবন কাটাতে পারছো, সেদিক থেকে তোমাকে সুখকপালীই বলতে হবে। তোমার ছেলেটা ঢাকায় কোথায় থাকে? ছোট মেয়েটার বয়স কত?'

'ছেলেটা ঢাকায় মালিবাগে থাকে। ছোট মেয়েটা এবার ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠবে। জীবনটা কি তাহলে তুমি এভাবেই কাটিয়ে দেবে?' স্বপ্না প্রশ্ন করলো।

'নাটাই থেকে সুতা ছেঁড়া ঘুড়ি এভাবেই তো স্বাধীনভাবে আকাশে উড়তে থাকে। এরও একটা মজা আছে। সবাইকেই যে জীবনে ধনী হতে হবে, সার্থক হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ব্যর্থতার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে, তাকে খুঁজে বের করে নিতে হয়।'

'আমাকে অন্তত বলো, তোমার উদ্দেশ্য কী?'

'আসলে আমারও আপাতত একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার দুটো ছেলেমেয়ে আছে। তাদের জন্য আমি এখনো বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। আমি চাই ছেলেমেয়ে দুটো বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক। আর আমি ধর্ম-কর্ম তেমন একটা বেশি করিনে, মোটামুটি যেটুকু না করলে না, সেটুকু করি। না ধার্মিক, না বকধার্মিক বলা যায়। অবসর সময়ে বই, পত্রিকা ও পুরোনো দিনের গান আমার সঙ্গী। ঐ যে একটা গান আছে না? 'আমি ছন্দহারা এক নদীর মতো ভেসে যাই, আমার চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই'— জীবনটা আমার সে রকমের। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই আমার ঠিকানা, নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নেই। এই অনিশ্চয়তাই আমার সুখ। তোমার ভালো থাকা আমার জীবনের চাওয়া।'

এতক্ষণে ট্রেন হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উপরে উঠলো। পদ্মার বিস্তীর্ণ বালুচর। মাঝে মাঝে পানি। মুর্তজা স্বপ্নাকে সেদিকে তাকাতে বললেন। মুর্তজার জীবন-নদীতে পুরোটাই বালুচর। নদীর এক কূল ভাঙে, অন্য কূল গড়ে। কিন্তু মুর্তজার একূল-ওকূল দুকূল ভেঙে গেছে। তাঁর আর ঠাঁই কোথায়? স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে মুর্তজা আজ কেন জানি দূরত্ব বোধ করছেন। প্রথম জীবনে সর্বক্ষণ যাকে কাছে পাওয়ার প্রবল আকুতি ছিল, কিন্তু দুজনে এতো কাছে থেকেও সে আকুতি একটুও আজ আর নেই। মনে হচ্ছে

দুজনের মাঝে আজ দুস্তর ব্যবধান। যেন এই জীবনশূন্য বিস্তীর্ণ পদ্মা নদীর দু প্রান্তে দুজনের অবস্থান। শুধু মুখের কথা, অতীত স্মৃতিচারণ, কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, এই-ই পথ চলার অবলম্বন। দুজনের ঠিকানা আজ দুদিকে, ভাবনা ভিন্নমুখী। সময়ের ট্রেনে চেপে চলার মতো। সবাই ট্রেনে উঠেছি, সামনে চলছি। থেমে নেই কোনো কিছু, কেউ— একই বগিতে বসে সামনের দিকে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে যার যার পথে, স্টেশন এলেই যার যার ঠিকানায় নেমে পড়বে। যদিও মুর্তজার স্টেশন ও ঠিকানা তিনি নিজেও জানেন না।

আরো কিছুক্ষণ পর ট্রেন ঈশ্বরদী জংশনে এসে থামলো। হয়তো বেশ সময় এখানে থেমে থাকবে। ইতোমধ্যেই দুপুর হয়ে গেছে। মুর্তজা স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণে তো তোমার খিদে পাবার কথা, কী খাবে, বলো?'

'কিছু না, আমি জার্নিতে কিছু খাই না। কেমন যেন বমি বমি আসে। তুমি কিছু খাও।'

মুর্তজা উপর থেকে ব্যাগটা পাড়লেন। ব্যাগের ভিতর থেকে একটা খাবারের বাটি বের করলেন। বাটি খুলে দেখলেন– চারটা রুটি, কিছু আলু ভাজি, একটা ডিম ভাজি।

'এটা তোমাকে কে দিয়েছে?' স্বপ্না জিজ্ঞেস করলো।

'আমি গ্রামে গিয়ে যে ভাই-ভাবীর বাড়িতে ছিলাম, সেই ভাবী সকালে আসার সময় একটা পানির বোতল আর এই খাবারের বাটিটা জোর করে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। খেয়ে দেখো ভালো লাগবে। আমাকে তো সব সময় হোটেলের গোঁফওয়ালা ভাবীদের হাতের রান্না খেয়ে চলতে হয়। আজকের এই খাবারটা আমার জন্য অমৃত।'

'তুমি খাও, আমার খেতে ভালো লাগছে না।' স্বপ্না বললো।

'তোমাকে খেতেই হবে। ঢাকা পৌঁছুতে রাত হবে। ততক্ষণে তোমার গ্যাস বেড়ে আরো বমি বমি লাগবে। নাও খাও। দুজনে খাই।'

মুর্তজা দুটো রুটি বের করে স্বপ্নার হাতে দিল। সামনে দুজনের হাঁটুর উপর একটা তোয়ালে বিছালো। স্বপ্না আলু ভাজি ও ডিম ভাজির একটা অংশ নিয়ে খাওয়া শুরু করলো। মুর্তজা স্বপ্নার প্রতিটা লোকমা যেন গুনছেন। স্বপ্নার ঢোক গেলার সময় হলে নিজেও ঢোক গিলছেন। স্বপ্নাকে খাইয়ে মুর্তজা খুবই তৃপ্তি পেলেন। নিজেও খেলেন। এবার একটা পোটেটো চিপস কিনলেন। মুখটা খুলে স্বপ্নার সামনে মেলে ধরলেন, 'নাও খাও'। স্বপ্না কিছু না বলে খেতে থাকলো। মুর্তজাও খেলেন। মুর্তজা এবার এক লিটারের একটা সফট ড্রিংস কিনলেন। স্বপ্নাকে বললেন, 'তুমিই-না বলছিলে পথে কেনা পানি তুমি খেতেই পারো না। এটা খাও, নইলে এই রোদে ডিহাইড্রেশনে ভুগবে, শেষে ইউরিনে জ্বালাপোড়া করবে।'

স্বপ্না বাধা দিলো না। বোতলের মুখটা খুলে দিতে বললো, তারপর বোতলে মুখ লাগিয়ে খাওয়া শুরু করলো। মুর্তজাকেও খেতে বললো। মুর্তজা 'আমার বুকে অসুবিধা, খাওয়া নিষেধ' বলে এড়িয়ে গেলেন।

মুর্তজার মনটা ভাবের আবেগে গদগদ হয়ে উঠেছে। যেন কত যুগ পরে একান্ত আপনজনকে আজ কাছে পেয়েছেন। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা যে কীভাবে উজাড় করে দেবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটা একটা স্টেশনে থামতেই মুর্তজা কয়েকটা বেদানা কিনলেন। ব্যাগ থেকে চাকুটা বের করে একে একে সেগুলো কাটলেন। দানাগুলো খোসা থেকে আলাদা করে স্বপ্নার হাতে দিতে লাগলেন। স্বপ্না খেতে থাকলো। মুর্তজাকেও খেতে বললো। তোয়ালের উপর রেখে দুজনে অনেকক্ষণ ধরে বেদানা খেলেন। এক পর্যায়ে মুর্তজা স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি হজ করেছ?'

'না, এখনো করিনি। তবে বাসা থেকে অনেক চাপাচাপি করছে। আমাকে খুব ধার্মিক বানানোর চেষ্টা চলছে। হয়তো তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি মনে করি আমার ঈমান এখনো এত মজবুত হয়নি, তাই একটু দেরিতে যাওয়া ভালো।'

'যাবার আগে সব অবৈধ সম্পদ গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে যাবে তো?'

'মনে হয় না।'

'অবৈধ সম্পদ ভোগ করবে, খাবে, ভবিষ্যতের জন্য আরো তৈরি করবে, আবার একটা অংশ ব্যয় করে হজ করবে, তা কীভাবে হয়? হজ থেকে পুতপবিত্র হয়ে এসে আবার সেই অবৈধ জিনিস খাবে, আবার অবৈধ সম্পদ ভোগও করবে, তা কি মেনে নেয়া যায়?' মুর্তজা সোজাসুজি বললেন।

'এসব বিষয় তো ঐ লোকটার ব্যাপার, আমাকে সে সবকিছু খুলে বলে না। আমি এত বুঝিনে। তবে অনেক কিছুর খোঁজ রাখি।'

'আচ্ছা বলো তো, তোমার কাছে টাকার মূল্য বেশি, ভালোবাসার মূল্য বেশি, না-কি সততার মূল্য বেশি?' মুর্তজার প্রশ্ন।

'আমার মনে হয় ভালোবাসার মূল্য বেশি।' স্বপ্না হেসে উত্তর দিলো।

'তা কী করে হয়? তোমার শুনতে খারাপ লাগবে কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। তোমাকে খারাপ কথাটাই বলছি, তোমার কাছে এবং আমাদের সমাজের কাছে টাকার মূল্যই বেশি। তোমার আব্বা একজন সৎ লোক ছিলেন। অথচ তুমি একজন অসৎ ও সুবিধাবাদী লোকের ঘর করছো। তাকে অসৎ কাজে বাধা দিচ্ছ না। তাকে ভালোবাসছো অনেকটাই টাকার কারণে, মনে মনে তার গুণগানে পঞ্চমুখ, এসবও

টাকার কারণে। আমার মতো কলেজশিক্ষককে মুখে ভালোবাসার কথা বললেও হাজি কেরামত সরকারকে কখনোই ছাড়বে না, সেটাও টাকার কারণে। হাজি কেরামতের টাকার তুমিও একজন অংশীদার, এটা সব সময় তোমার মাথায় প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। আমার মতো কলেজশিক্ষককে তোমাদের এ শহরে কেউই চেনে না, সম্মানও করে না। তোমাকে এবং হাজি কেরামত সরকারকে অধিকাংশ লোকই চেনে ও সম্মান করে। সমাজ তো তোমাদের টাকাপয়সা কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞেস করে না। বরং টাকা আছে বলে সমীহ করে চলে। তোমার ছোট বোন ছোটোবেলা থেকেই ধার্মিক। তার স্বামীও মোটামুটি ধার্মিক ও সৎ। তোমার ছোট বোন তাকে কোনোভাবেই অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে দেয় না। তারা কত বার হজে যেতে পেরেছে? সমাজ তাদের সততার কী মূল্য দিয়েছে? তুমি আমার ভালোবাসার বিনিময়ে আমার প্রতি তোমার ভালোবাসায় কতটুকু ছাড় দেবে সেটা কি ভেবে দেখেছ? তুমি তোমার ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আমাকে ভালোবাসতে যাবে কি-না আমার সন্দেহ। এটাই সাধারণ বাস্তবতা। আরো কথা হলো, আমি যদি আজ মরেও যাই, তুমি মন খুলে কাঁদতেও পারবে না, কিংবা পরিবেশের কারণে কাঁদবে না, বা মনে একটা বুঝ এনে ফেলবে। ভালোবাসার তুলনায় লোকলজ্জার ভয়ে সংকোচ বোধ বেশি কাজ করবে। এখানেই হাজি কেরামতের ভালোবাসার কাছে আমার ভালোবাসার পরাজয়। নিশ্চয়ই আমার অবস্থান তিন বা চার নম্বরে যাবে। তুমি হাজি কেরামতকেই সবকিছুর আগে স্থান দেবে। এটা সামাজিক বাস্তবতা। আরেকটা বিষয় আছে– তুমি এতটা বছর ধরে একটা পরিবেশ, চারপাশের মানুষজনকে আপন ভাবতে শিখেছ। তাদের সবার সাথে তোমার সখ্য। তারা আমার অচেনা। তোমার স্মৃতিতে তারা ভাস্বর। সেই চিরচেনা পরিবেশ ছেড়ে আরেকটা নতুন পরিবেশকে হঠাৎ আপন করে নেয়া অতটা সহজ নয়। কথাগুলো অপ্রিয় হলেও সত্য ও বাস্তব। এর ব্যতিক্রম হলেই বুঝবো যে, তুমি চিরাচরিত ধারার উর্ধ্বে এবং তুমি তোমার সাধনাকে জয় করতে পেরেছ। তাহলে বোঝা যাবে, তুমি আমাকে ভালোবাসার বিনিময়ে সবকিছু ত্যাগ করতে চেয়েছো এবং আমাকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসো। নইলে তুমি গতানুগতিক স্রোতে ভেসে যাবে। শুধু মুখের স্বীকৃতি নিরেট বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের পরই সোনা খাঁটি না ভেজালযুক্ত— তা বোঝা যায়।'

'তুমি যা বলছো তা সবার ক্ষেত্রে খাটে না। দেখো, ভবিষ্যৎই সব বলে দেবে। তোমার দেখা একবার যখন পেয়েছি, সংসার আমাদের একদিন হবেই।' স্বপ্না দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল।

'তুমি কি এখনও গ্রামে যাও?' মুর্তজা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো।

‘যাওয়া হয় না বললেই চলে। এখন জীবনটাই যশোরভিত্তিক হয়ে গেছে। বছরে দু বার অন্তত মা-বাপের কবর জিয়ারত করতে যাই। ওখানে আমাদের আর কেউ নেই। ঐ রাস্তাতে গেলেই বার বার তোমার স্মৃতি ভেসে ওঠে। মনে হয় কখন জানি তুমি সামনে এসে পড়বে। এতটা বছর আমার চোখে তুমি সেই পুরোনো মুর্তজাই রয়ে গেছো। স্মৃতিতে তোমার প্রথম জীবনের সেই ছবিই দেখি। ছবিটা আমার চোখে স্থির হয়ে আছে। আজ আবার নতুন ছবি সাজালাম। তোমার চেহারায় যে এতো পরিবর্তন এসেছে, তা ছিল আমার কল্পনাতীত। তুমি তোমার গ্রামের বাড়ির এলাকা না বললে আমার পক্ষে প্রথমেই তোমাকে চেনা সহজ হতো না। যদিও তুমি সেই তরুণই রয়ে গেছো, শরীরটা খারাপ হয়ে গেলেও সেই তারুণ্য ও চঞ্চলতা ধরে রাখতে পেরেছো। খোদার কাছে আমার সাধনা নিশ্চয়ই কম নয়, নইলে তোমার দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল না।’

‘আমরা যদিও গানে বলি, ‘অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে।’ আসলে অতীত স্মৃতিকে কেউই মন থেকে মুছতে পারে না। মনে আসবেই আসবে, ব্যথা দেবেই দেবে। এর থেকে নিস্তার পাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কেউ এর কষ্ট নিয়ে সামনে চলে, কেউ-বা ভেঙে পড়ে। বেদনার স্মৃতিই বেশি মনে থাকে। প্রতিটি কাজে প্রতিক্ষণে গভীরতর গোপন স্মৃতি আপনাআপনি মনে আসেই, ব্যথা দেয়। বাধা দেয়ার মতো মন থাকে না। মন তা গোপনে অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। তারুণ্যের কথা বলছো? শরীর আমার যা-ই হোক, আমার তারুণ্য আমৃত্যু থাকবে, এটা আমার প্রকৃতি। আমার মন কখনো জরাগ্রস্ত হবে না। আমার জরা ও মৃত্যু একসাথে হবে।’

ট্রেন যমুনা নদীর উপর দিয়ে চলতে লাগলো।

মুর্তজা প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি না খুব বেড়াতে ভালোবাসতে? আমাকে সাথে নিয়ে তোমার খুব বেড়ানোর ইচ্ছে ছিল। এই দেখো সেই যমুনা নদী। আমরা এখন ‘জার্নি বাই ট্রেন’ করছি। আমরা যমুনা নদীর তীরে ঐ ঝাউবনে এখনই চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতে পারি। কেউ কোনোদিন আমাদের আর খুঁজে পাবে না। প্রথম জীবনের সাধ পূরণ হবে। তুমি কি জানো, এই যমুনা নদীর তীরেই প্রেমের সমাধি নামে তাজমহল সৃষ্টি হয়েছে?’

স্বপ্না বললো, ‘ছবিতে দেখেছি, বাস্তবে যেতে পারিনি। তোমাকে সাথে নিয়ে তাজমহল দেখার কল্পনা এখনো করি। তোমাকে নিয়ে জীবনের সব আশাই অপূর্ণ রয়ে গেছে। জানি না এসব আশা পূর্ণ হবে কিনা।’

‘তুমি তো কৈ মাছ ও কুল খেতে খুব পছন্দ করতে। এখনও খাও কিনা?’ মুর্তজা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো।

‘হ্যাঁ, পেলেই খাই। এখনো আমার কুল ও কৈ মাছ পছন্দ।’

‘বেশ ভালো। আমিও তোমাকে সাথে নিয়ে দুজনে বসে কৈ মাছ ও কুল খাবো আশা ছিল। তোমাকে হারানোর পর থেকে ও-দুটো ছেড়েছি। ভবিষ্যতে কোনোদিন একসাথে বসে খেতে পারলে খাবো। নইলে এ জীবনে আর না। আজ তোমার বেদানা খাওয়া দেখে মনে হলো, বেদানাও তোমার খুব পছন্দ। আমি বেদানার দানা খোসা থেকে ছাড়িয়ে দিলাম, আর তুমি খুব তৃপ্তির সাথে খেলে। এটাও আমার ভবিষ্যৎ একটা স্মৃতি। ভবিষ্যতে আমার পক্ষে একা বসে বেদানা খাওয়া খুব স্মৃতিবিধুর হবে। অর্থাৎ এটার স্মৃতিও কৈ মাছ ও কুলের মতো হয়ে গেল। তোমাকে সাথে নিয়ে খাওয়া ছাড়া আমি এটা আর একা খেতে পারবো বলে ভাবিনে। হয়তো এ ফলটা থেকেও আমি আজীবন বঞ্চিত হলাম।’ মুর্তজা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

‘তুমিই-না বলতে, জীবনে যা যায়, চিরদিনের মতো যায়। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস জীবনের সব পথই অসীমে যায় না। কোনো কোনো পথ আছে যা ঘুরে ফিরে আবার আসে। দেখো, ভবিষ্যতে আমার এ কথাটা সত্য হবে। আমরা আবার ঘর বাঁধবো, একসাথে বেড়াবো।’

‘যে পাখি একবার উড়ে যায়, সে আর খাঁচায় এসে ধরা দেয় না, শুনেছি। তবে প্রকৃতির খেলা বোঝার সাধ্য কারো নেই। কোন ঘাটের নৌকা ভেসে কোন ঘাটে গিয়ে যে শেষমেশ নোঙর করে, সমীকরণ মেলে না। তাই পূর্বানুমানও করা দুঃসাধ্য। তোমার আশা পূরণও হতে পারে আবার দুরাশাও হতে পারে। কোন অজানা পথের বাবুই পাখি উড়ে এসে কোথায় যে ঘর বাঁধে, বলা বেশ দুরূহ। জীবনে অসম্ভব বলতে কিছু নেই। তবে আমার জীবন তো আমি জানি, ভালো থাকা আমার কপালে সয় না।’

সন্ধ্যা ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে। স্বপ্নার বাসা থেকে হয়তো হাজি কেরামত সরকার কিংবা তার উত্তরাধিকার বার বার ফোন দিচ্ছে। তারা জানতে চায়, কতক্ষণে ট্রেন ঢাকা পৌঁছবে।

‘এই ট্রেন যদি বিকল হয়ে মাঝপথে থেমে থাকতো, আমি আরো অনেক সময় তোমার পাশে কাটাতে পারতাম!’ স্বপ্না আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বললো।

‘বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে, যা তোমার চাওয়ার বিপরীত।’ মুর্তজা সান্ত্বনার সুরে বললেন।

অবশেষে সন্ধ্যার বেশ পর ট্রেন কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছাল। স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই স্বপ্না মুর্তজার ফোন নম্বর চেয়ে নিল। ছেলে-বউমা স্টেশনে মাকে নিতে আসবে জানালো। তারা স্বপ্নাকে স্টেশনের মূল গেট থেকে বেরিয়ে সামনে পিলারের কাছে দাঁড়াতে বলেছে। মুর্তজা গেট পর্যন্ত স্বপ্নাকে সাথে করে নিয়ে এলো। তারপর স্বপ্না একা পিলারের কাছে গেল। ছেলে-বউমা অপেক্ষা করছে। মুর্তজা গেটে ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্না এগিয়ে গিয়ে তাদের গা-মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ কী যেন বলাবলি করলো, তিনজন সামনের দিকে এগুলো। মুর্তজা গেট থেকে কিছু দূর এগিয়ে এসে সেই পিলারের কাছে অনেকক্ষণ তাদের পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বেশ দূরে গিয়ে বেবিট্যাক্সি স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডে গিয়ে তারা ট্যাক্সিতে উঠলো। পাশের চায়ের দোকান থেকে গান ভেসে আসছে, মুর্তজা গেট থেকেই গানটা একমনে শুনছেন আর ওদের বিদায়দৃশ্য দেখছেন। গানটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি পিলারের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলেন।

‘এ জীবনে আর কোনো সাধ নেই
তুমি ভালো আছো এটুকু জেনেই সুখী হব,
নিয়তির হাত ধরে তোমার অনেক দূরে
একাকী দাঁড়িয়ে রব-ও-ও
তুমি ভালো আছো এটুকু জেনেই সুখী হব,
আমি চিরদিন এটুকু জেনেই সুখী হব ... ... ।’

মুর্তজার কাছে একটা বিষয় অবাক লাগলো। তিনজনে এতদূর হেঁটে গেল, কিন্তু স্বপ্না একবারও পিছনে ফিরে তাকালো না। মুর্তজা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, না-কি চলে গেলেন, সেটাও দেখলো না। ওরা যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর মুর্তজা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, ধীরে ধীরে বাসার দিকে পা বাড়ালেন। তিনি ভাবলেন, এতো পথ একসাথে এলাম, এতো কথা বললাম। আর স্বপ্না আমাকে পিছ ফেলে নির্দ্বিধায় চলে যেতে পারলো! আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, সে একবারও পিছন ফিরে তাকালো না! অতীতের সেই স্বপ্নার কত পরিবর্তন! এত বছরে দুটো ভিন্নমুখী জীবন-পথের সাময়িক ক্রসিং।

৫.

রাতে বাসায় ফিরে মুর্তজার চোখে ঘুম নেই। বিছানায় এদিক-ওদিক করছেন। ভাবছেন, এতটা বছর পর আজ আমার এ আবার কী হলো! মনে হচ্ছে, তিনি যেন নতুন স্বপ্নাকে এতো দিন পর খুঁজে পেয়েছেন। বার বার স্বপ্নার বর্তমান মুখখানা চোখে ভেসে আসছে। স্বপ্না সব কথারই পজেটিভ উত্তর দিলো এবং সে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আশাবাদী বলে মনে হলো। মুর্তজার কাছে সবই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। জীবনের

অনেক কিছুকে ভাবা যায়, কল্পনা করা যায়, কিন্তু দিনের বাস্তবতায় সব বিলীন হয়ে যায়। মুর্তজা এত চেষ্টা করেও স্থির হতে পারছেন না। তার রুমের দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল, তিনি এবার পুবের জানালাটাও খুলে দিলেন। মেঝেতে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন, মনের স্থিরতা আনতে পারলেন না। ভাবছেন, স্বপ্না এতক্ষণ ছেলের বাসায় ঘুমে বিভোর। স্বপ্না তাঁকে নিয়ে এত ভাবার মানুষ নয়। যে স্বপ্নাকে এতদিন পরস্ত্রী এবং স্বার্থপর ভেবেছেন, তাকে নিয়ে আজ আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। মনকে সাজাতে হচ্ছে। কিছু কিছু ভাবনা বয়স মানে না। মন থেকে একেবারে দূর করে ঝেড়ে ফেলা যায় না।

রাত তিনটা বেজে গেল। ঘুম আসছে না। অনন্যোপায় হয়ে মোবাইল সেটে রেকর্ড করা গানের বোতামে টিপ দিলেন। গান ভেসে আসতে থাকলো:

'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
তোমার খোলা হাওয়া,
টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি
আমি ডুবতে রাজি আছি, তোমার খোলা হাওয়া।
সকাল আমার গেল মিছে বিকেল যে যায় তারি পিছে গো,
রেখো না আর বেঁধো না আর কূলের কাছাকাছি
আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি,
তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
তোমার খোলা হাওয়া... ।'

কেন জানি মুর্তজার একাকীত্বের জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গতায় ছন্দপতন হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন না, এটা কীভাবে সম্ভব। সারারাত জেগেই কাটলো। তিনি অফিসে গেলেন। দুপুর বারোটার আগে একটা অজানা নম্বর থেকে ফোন এলো। ফোনটা ধরতেই স্বপ্নার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কেমন আছো?'
'ভালো আছি, তুমি?'
'আমিও ভালো। গত রাতে শুয়ে তোমার মুখচ্ছবিটা চোখে বার বার ভেসে উঠছিল। আমার তো কোনো ফোন নেই। অন্য একটা ফোন দিয়ে সুযোগমতো তোমাকে ফোন দিচ্ছি। তাই ফোন দিতে দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে ফিরে গিয়ে এবার একটা ফোন নেব। তারপর তোমাকে আমার নম্বরটা দেব।'

'আচ্ছা দিও। গতকাল আমি স্টেশনে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকলাম, না-কি বাসায় রওনা দিলাম, একবারও তো পিছনে তাকিয়ে দেখলে না। বিষয়টা ভেবে আমি খুব অবাকই হলাম। নিশ্চয় ছেলে-বউকে পেয়ে খুব আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলে?'

‘না, তা নয়, হয়তো তুমি কষ্ট পেয়েছো। আমি ভাবলাম, ছেলে-বউয়ের সামনে পিছন ফিরে তাকালে ওরা কী-যেন-কী আবার মনে করে, তাই।’

এ উত্তরে মুর্তজা স্বপ্নাকে তার সংসারজীবনের বিষয়ে খুব আত্মসচেতন ভাবলো। আবার ভাবলো, একবার পিছনে তাকালে কীই-বা এমন হতো! কে এমন খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছে, ও কেন পিছনে তাকাচ্ছে। চোরের মন পুলিশ পুলিশ। এটা ওর মনের দুর্বলতা।

নীরবতা ভেঙ্গে স্বপ্না বললো, ‘কই শুনছো?’
‘হ্যাঁ, বলো শুনছি।’
‘গতকাল আমি বুঝলাম, জীবনে কী রত্ন হারিয়েছি! বাপ মারা গেছেন ছোটোবেলায়, মাও মারা গেছেন অনেক বছর হলো। আমার প্রতি এত যত্ন নিয়ে কেউ কখনো আমাকে খাইয়েছে কি না, মনে পড়ে না। কাল তোমার খাবার তোমার হাতে আমি খেলাম। খাবার খেতে আমি যতবার ঢোক গিললাম, আমি লক্ষ করলাম, তুমিও ততবার ঢোক গিললে। আমাকে খাইয়ে তুমি খুবই তৃপ্তি পেলে। এ দুনিয়ায় আমার এমন দরদি আর কেউ নেই, আমি তা ভালোভাবে বুঝেছি।’

কথাগুলো বলে স্বপ্না কাদঁতে লাগলো।

একটু শান্ত হলে মুর্তজা বললেন, ‘শোনো, একটা গান আছে জানো?’ ‘দয়াল, যার কপালে যা লিখাছেন রে-এ, দুঃখ কাঁদলে যায় না।’ ‘গতকাল আমি তোমার জন্য তেমন ভালো কিছু করিনি। এটা তোমার মনের দুর্বলতা। ওটুকু না খেলে তোমার ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন হয়ে যেত, তাই একটু অধিকার খাটিয়ে খাইয়েছি। আমার মতো ক্ষুদ্র মাস্টারসাহেবের দুটো রুটি তোমার হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কীই-বা করার আছে? আমার এ নগণ্য সেবাকে তুমি ফেরত না দিয়ে গ্রহণ করেছো, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার এ যত্নটুকুকে তুমি এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখো না। শেষে আমার প্রতি বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে। আমার এ জীবনপথ অনেক বন্ধুর, যা তোমার ধাতে সইবে না। শেষে কষ্ট পাবে।’

‘গতকাল তোমাকে দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছে। তুমি জীবনে যে এত অসুখী, আগে জানতাম না। শুনেছিলাম, তুমি খুব সুখে আছো। আরো শুনেছিলাম, তুমি নিজের পছন্দমতো প্রেম করে বিয়ে করেছো।’

‘না, সবই ভুল তথ্য। আমার বিয়েটা অভিভাবক মহলের চাপে ঘটকের মাধ্যমে হয়েছিল। আমি অভিভাবককে খুশি করার জন্য বিয়ে করেছিলাম। বিয়েতে আমার সম্মতি অসম্মতি কিছুই ছিল না। আমার এ তথ্য তুমি বিশ্বাস করতেও পারো, না-ও করতে পারো, এটা তোমার ব্যাপার।’

‘গতকাল ইচ্ছে করছিল, স্টেশন থেকে তোমার হাত ধরে তোমার বাসায় গিয়ে উঠি।’ স্বপ্না একটু হেসে বললো।

‘এটা তোমার আবেগপ্রবণ কল্পনা। কল্পনায় অনেক কিছু করা যায়, বাস্তবে সম্ভব হয় না। তুমি আমার হাত ধরে এলেই কি সমাজ তা মেনে নেবে? হাজি কেরামত সরকার তো আমাকে জেলে ঢুকিয়ে ছাড়বে।’

‘আমি সম্মত থাকলে ঐ লোকটা তোমার কিছুই করতে পারবে না। তুমি মিছেমিছি ভয় পাও।’
‘আমি ভয় পাচ্ছিনে, বাস্তবতা বলছি।’

মুর্তজা লক্ষ করছে, স্বপ্না বার-বারই তার স্বামী হাজি কেরামত সরকারকে ‘ঐ লোকটা’ বলে সম্বোধন করছে। কেন করছে তা মুর্তজার মাথায় আসছে না।

‘শোনো, আমার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে। বউমা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। এখান থেকে তোমার সাথে যোগাযোগ করা খুবই অসুবিধা। তিন-চার দিনের মধ্যে বাড়িতে ফিরবো, তারপর কথা হবে।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। সময় পেলে বাড়ি ফিরে কথা বোলো। আমি তোমাকে বাধ্য করছিনে। তোমার সুবিধা-অসুবিধা তুমি দেখো। খোদা হাফেজ।’

মাঝখানে চার দিন কোনো খোঁজখবর নেই। পঞ্চম দিন দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে নতুন নম্বর থেকে মুর্তজার ফোনে একটা ফোন এলো। মুর্তজা ফোন ধরতেই অন্য প্রান্ত থেকে বললো, ‘গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছি। ঐ লোকটা বাসা থেকে বেরিয়ে গেলেই দোকানে গিয়ে আগে একটা ফোন নিয়েছি এবং তোমাকেই প্রথম ফোন দিয়েছি। নম্বরটা সেভ করে রেখো।’

‘আচ্ছা বেশ ভালো। আমি তো গতকাল থেকেই তোমার ফোনের অপেক্ষা করছি। তা তোমার শরীরটা ভালো আছে তো? সেদিন আসার সময় আমাকে তুমি বলছিলে যে, একবার জন্ডিস হয়েছে, দুবার টাইফয়ড হয়েছে, মাঝেমধ্যেই জ্বর হয়, মাথা প্রচণ্ড ব্যথা করে, আবার হাই-প্রেসার। আমি তো দেখছি তোমার শরীরের একটা ভালো ট্রিটমেন্ট করানো দরকার। তুমি শরীরের প্রতি অবহেলা করছো।’

‘হ্যাঁ, এবার ঢাকায় গেলে ছেলেটা আমাকে ডাক্তার দেখিয়েছে। অনেকগুলো টেস্টও করিয়েছে। ডাক্তার ওষুধ লিখেছেন। খেয়ে দেখি কী হয়। এবার তুমি তোমার শরীরের একটু যত্ন নাও। অন্তত আমার জন্য হলেও নাও।’

‘আমার শরীর নিয়ে তেমন কিছু ভাবিনে। প্রকৃতির এই অন্তর্দহন থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায় ততই ভালো। আমি মুক্তির অপেক্ষায় আছি।’

‘তুমি জানো না, এ সংসারে আমি খুব মানসিক কষ্টে আছি। আমার এ কষ্ট দেখার কেউ নেই। মানুষ বাইরে থেকে আমাকে খুব ভালোই দেখে, সুখী ভাবে। আমি হাসিখুশি থাকি তাই। ঐ লোকটার সাথে আমার সম্পর্ক তেমন একটা ভালো না। তার মতো সে চলে, আমার মতো আমি। কথাবার্তা হয়-না বললেই চলে। আমার ভালো-মন্দ সে বুঝতে চায় না। কোনো কিছু জিজ্ঞেসও করে না। তার মনোমতো সে করে। আমিও এড়িয়ে চলি।’ স্বপ্না অনেক কষ্টের কথা বললো।

‘ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, আমি তোমার বিপদে তোমার পাশে থাকবো। যখনই কোনো বিপদে পড়ো, আমাকে স্মরণ কোরো। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। আর তুমি তোমার শরীরের দিকে তাকাও। নিজে যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করো।’

‘বড় ছেলেটাকে নিয়ে কিছু ভাবিনে। যত ভাবনা এই ছোট মেয়েটাকে নিয়ে। সব সময় মনটা সংসার ছেড়ে কোথাও চলে যেতে চায়। কিন্তু মেয়েটাকে রেখে কোথাও যেতে পারিনে। শহরের পরিবেশও খারাপ। ওকে নিয়ে অসুবিধার মধ্যে আছি। ঐ মেয়েটা পেটে আসার আগেও যদি তোমার সাথে দেখা হতো, এতদিন আমাদের সংসারজীবন পনেরো বছরের বেশি হয়ে যেত। তোমার ফোন নম্বর আমার কাছে ছিল। কেন যে তখন ফোন করিনি! এখন ভুল বুঝছি।’

‘তোমার নীরবতা দেখে আমি কোনোদিন এগোইনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম তুমি ভালো আছো। কারো সুখের ঘর ভাঙা আমার উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমি একজন পুরুষ। কোনো স্ত্রীলোকের কাছে অনাহূতভাবে ফোন করা আমার সাজে না। আমি আমার ব্যথার বোঝা নিয়ে বেশ আছি।’

‘তোমাকে নিয়ে এ কদিনে আমি খুব ভেবেছি। কোনো কূল-কিনারা করতে পারছিনে। সারা রাত তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি। বিভিন্ন জায়গায় তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি। দুজনে বেড়াচ্ছি, চলছি, খুব আনন্দ পাচ্ছি। ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি শুধু শূন্যতা। আমি খুব হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমাকে ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে পারছিনে। আমার যত ভাবনা এখন সব তোমাকে নিয়ে। এতটা বছর তো কাটালাম, কখনো এমন তো হয়নি। সেদিন তোমাকে দেখার পর থেকে আমার জীবনের সব চিন্তা, সাধ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিনে।’

‘নিজে ধৈর্য ধর। এত উন্মনা হলে হবে না। বাস্তবতা অনেক কঠিন। স্বপ্নে অনেক কিছু পারবে, বাস্তবে তা পারবে না। তুমি এখন সংসারের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছো। সব বয়সে সবকিছু সম্ভব হয়ে ওঠে না। আরো অনেক ভাবো।’

‘বিভিন্ন লোক সব সময় বাসায় আসে, থাকে। ফলে কথা বলা অনেক সময় সম্ভব হবে না। সাধারণত বিকালে এবং সন্ধ্যার পর মেয়েটা যখন পড়তে বসে তখন কথা বলা সম্ভব। তোমার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।’

‘না, আমার কোনো অসুবিধা নেই, চার তলার ছাদের একটা রুমে একা থাকি। কলেজ থেকে ফেরার পর বিকালে সাধারণত ফ্রি থাকি। সন্ধ্যার পরও তাই। দিনের বেলা পাশের গ্লাসঘেরা রুমে সহকর্মীরা থাকে। তাদের সামনে কথা বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া এক রুমে কথা বললে পাশের রুম থেকে শোনা যায়। অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। বেশি প্রয়োজন হলে দিনের বেলায়ও অল্প কথা বলো। তুমি নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারো। তবে আমার নিজের কথা খুব কম। কথা সব ফুরিয়ে গেছে। যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা মাস্টারি কথা। এসব কি তোমার ভালো লাগবে? তুমি হয়তো উৎসাহ পাবে না।’

‘তুমি যতটুকু পারো বোলো, উভয়েরই সময় কাটবে। এতো বছর পর তোমার দেখা পেয়েছি। মনটা কোনোভাবেই বাঁধ মানছে না। জীবনের অনেক ছোটোখাটো ভুলত্রুটি আছে। ছোটোবেলায় বুদ্ধি ছিল অপরিপক্ক। তখন বুঝিনি, এখন বুঝি। নয়তো আমাদের এ পরিণতি হতো না। তাছাড়া আমার কেন জানি মনে হয়, তুমি ইচ্ছে করলে যোগাযোগ করতে পারতে। তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছ।’

‘কোনো পুরুষমানুষই চায় না তার ভালোবাসার সাথী অন্য কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুক। তার চেয়ে ঐ পুরুষ মানুষটার আত্মহত্যা করা অনেক ভালো। ভবিষ্যতের কথা ভেবে হয়তো কেউ কেউ আত্মহত্যা করে না। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি আজীবন বয়ে বেড়ায়, দূরে সরে যায়, মহিলাদের ঘৃণা করতে শেখে। যদিও প্রকৃতির কারণেই মহিলাদের থেকে দূরে থাকতে পারে না। এটা সৃষ্টিরহস্যের গূঢ়তত্ত্ব। এটা এখন আমিও বুঝি, তখন অপরিপক্ক বুদ্ধি ছিল, আবেগপ্রবণতা অনেক বেশি ছিল, ফলে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি উভয়েরই ভুল থাকতে পারে। তবে আমি তোমার মতামত জানার জন্য হলেও যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। আমি আজ অন্য কাজে ব্যস্ত।’ শিক্ষকদের মিটিং আছে বলে মুর্তজা ফোন রেখে দিলেন।

মুর্তজার স্বভাব বদলালো না। তিনি স্বপ্নার সাথে সম্পর্কের শুরু থেকে এ পর্যন্ত একবার আনুপূর্বিক ভাবলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, তারপর স্বপ্নার বর্তমান মানসিক অবস্থা ও তার সংসারে অশান্তির কথা মন দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্বপ্নার প্রতি ভালোবাসা তার কোনোদিনও কম ছিল না, তবে অভিমানও ছিল। অনেকগুলো বছর সংসার করতে গিয়ে যখনই সালেহার সাথে মুর্তজার অবনিবনা হয়েছে, তর্কাতর্কি হয়েছে কিংবা সালেহা কোনোভাবে মুর্তজার মনে আঘাত দিয়েছে, স্বপ্নার কথা মুর্তজার আরো বেশি করে মনে পড়েছে। ভেবেছেন, স্বপ্না হলে তাঁকে হয়তো এ আঘাতটা দিতে পারতো না, তাঁর প্রতি সমব্যথী হতো। এতে স্বপ্নার প্রতি দুর্বলতা আরো বেড়েছে। আজ স্বপ্নার কষ্টের কথা মুর্তজার মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। মুর্তজার ধারণা ছিল, স্বপ্না ধনীর ঘরে সুখেই আছে কিন্তু

স্বপ্নার কথায় এখন ভাবছে– স্বপ্না তো সুখে নেই, বরং অনেক কষ্টে আছে। তাঁর সমবেদনাশীল মন কীভাবে স্বপ্নার এ কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করা যায়, সে-দিকে মনে মনে যত্নবান হলো।

আসলে মুর্তজা প্রথম থেকেই উদার মনের, বিশ্বাসপ্রবণ, স্বার্থত্যাগী ও প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষ। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের ভালোর জন্য কিছু করা তাঁর স্বভাব। অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া তাঁর অভ্যাস। তাছাড়া স্বপ্নার প্রতি অকৃত্রিম দীর্ঘলালিত ভালোবাসা তার মনে স্বপ্নার জন্য সবকিছু করার প্রত্যয়কে জাগিয়ে তুললো। তাঁর ভালোবাসার গভীরতা অনেক বেশি। এ অবস্থা থেকে তাঁর মানসিক অবস্থাকে ফিরিয়ে নেয়া অতটা সহজসাধ্য নয়। মুর্তজা এখন স্বপ্নার মঙ্গলের স্বপ্নে বিভোর।

সময়ের প্রতিটি মুহূর্তের আগমনে মানুষের মনের নিত্য পরিবর্তন হয়। এর শেষ কোথায় বলা দুঃসাধ্য। ভাবনাটাও কল্পনাতীত।

পরের দিন বিকালে মুর্তজা স্বপ্নাকে ফোন করলেন। এখন কী করছে জানতে চাইলেন।

স্বপ্না বললো, 'কেন জানি দুশ্চিন্তা করছি। রাতে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। হয়তো বা প্রেসার বেড়ে গেছে। ঘাড় ব্যথা করছে।'

মুর্তজা তাকে এখনই প্রেসারটা মাপার ব্যবস্থা করতে বললেন। প্রেসারের ওষুধটা আগে খেতে বললেন। প্রয়োজনে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আজ আগে আগে ঘুমাতে বললেন। দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। আরও বললেন, 'যেহেতু তোমার প্রেসার আছেই, একটা ডিজিটাল প্রেসার মাপার যন্ত্র বাসার জন্য কিনে নিও। যে কোনো সময় প্রয়োজনে নিজেই মাপতে পারবে।' কথা না বাড়িয়ে বিকেলের নাস্তা করে বিশ্রাম নিতে বললেন। আর শরীরের যত্ন নিতে বললেন।

এখনই মেয়ের হাউস টিউটর বাসায় আসবে জানিয়ে স্বপ্না ফোনটা রেখে দিল।

স্বপ্নার শরীরের অবস্থা কেমন জানতে না পেরে মুর্তজা দুশ্চিন্তার মধ্যে রাত কাটালেন। সকাল থেকে স্বপ্নার ফোনের অপেক্ষায় আছেন। বিকালে স্বপ্না ফোন দিল। শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালো, জানালো।

স্বপ্নার শরীরটাও ভালো থাকে না। বিভিন্ন অসুস্থতা লেগেই থাকে। একটু অসুস্থ হলে কিছু খেতে চায় না। তোষামোদ করে, আদর-যত্ন করে খাওয়াতে হয়। স্বপ্নার অসুস্থতার কথা শুনলেই মুর্তজাও দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। ফোনের মাধ্যমেই খোঁজ-খবর নেন। খাওয়া-দাওয়ার পরামর্শ দেন। স্বপ্না সুস্থ হয়ে উঠলে মুর্তজা স্বস্তি পান।

মুর্তজা ভাবছেন, যে দায়িত্ব পালন করতে চায় ও পালন করে, তার মাথায়ই দায়িত্ব এসে চাপে। যত অগোচরেই থাকে দায়িত্ব তাকে খুঁজে নেয়। আর স্বপ্নার এ-চিন্তা নিজের করে ভাবা, বিপদের সময় তার পাশে দাঁড়ানো, এটা মুর্তজার দায়িত্বের অংশ, অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। তাঁর মানসিক তৃপ্তি ও শান্তির বিষয়। তিনি এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন এবং নিজেকে ধন্য মনে করবেন। ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে গ্রহণ করবেন।

দুই দিন পর স্বপ্না ফোন দিল। ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসার পর একটা দুঃসংবাদ দিল। সেতু হঠাৎ করে বেশ অসুস্থ। গতকাল চুলার ধারে বসে ছিল। হঠাৎ মাথা ঘুরে চুলার পাশে পড়ে গিয়েছিল। গতকাল স্বপ্না তাকে দেখতে গিয়েছিল। এখন মোটামুটি ভালো আছে। তবে বিছানায় বিশ্রামে আছে। আরো বিভিন্ন কথা শেষে স্বপ্না ফোন রাখলো।

একটু পরে মুর্তজা সেতুকে ফোন করলো। একটা খারাপ সংবাদ শোনার পর ফোন করাটা কর্তব্য। তাছাড়া সেতুর প্রতি স্নেহ-মমতা তো তাঁরও কম নয়। সেতু বললো, 'দাদা, গতকাল দুপুরের আগে চুলার ধারে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে পাশে ঢলে পড়ে গিয়েছিলাম। স্যালাইন ও ইনজেকশন দেওয়ার পর জ্ঞান ফিরে পেয়েছি কিন্তু শরীরটা এখনো বেশ দুর্বল। উঠতে পারছিনে। আপা গতকাল বিকালে দেখতে এসেছিল।'

মুর্তজা তাকে খাবার ও ওষুধের উপর গুরুত্ব দিতে বললেন। প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি আবার ভারতে যাবার পরামর্শ দিলেন। নইলে ঢাকায় চলে আসতে বললেন। ওখানকার লোকাল চিকিৎসা ঠিক হবে না বলে জানালেন। দেরি করাটা ঠিক হবে না, তাও জানালেন। বেশি অসুবিধা হলে ফোনে যোগাযোগ করতে বললেন। টাকা-পয়সা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলেন।

৬.

গত তিন দিন মুর্তজা স্বপ্নাকে ফোন করেননি। স্বপ্নাও ফোন করেনি। সন্ধ্যার পর স্বপ্নার ফোন এলো। মুর্তজা তাকে 'কেমন আছো' জিজ্ঞাসা করতেই বললো, 'তোমার উপর খুব রেগে আছি। তাই গত তিন দিন আর ফোন করিনি। তাছাড়া বাসাতেও লোকজন বেশি। ফোন করারও সুযোগ হচ্ছিল না।'

'হঠাৎ আমার উপর রেগে যাবার কারণ কী? কী এমন অন্যায় তোমার কাছে করলাম? আমাকে ভুল বোঝার জন্য তোমার তো জুড়ি নেই।'

‘না, অন্যায় না। তুমি তখন যদি আমাকে ফাঁকি না দিতে, যোগাযোগটা করতে, তাহলে আমরা এতদিন একটা সুখের সংসার করতে পারতাম। আমার এত কষ্ট করতে হতো না। তোমাকে পেলে আমি অনেক সুখী হতাম। তুমি ইচ্ছে করেই আমার সাথে যোগাযোগ করোনি।’ স্বপ্নার কণ্ঠে ক্ষোভ ও অভিমানের সুর।

‘বুঝলাম আমি যোগাযোগ করিনি। তুমিও কি যোগাযোগ করেছিলে? চেষ্টাও কি কোনোদিন করেছিলে?’
‘আমি কত চেষ্টা করেছি তুমি কি জানো? চেষ্টা করিনি এ-কথা বললে আমি কিন্তু আরো রেগে যাব।’

‘আমি তোমার প্রশ্নের পিঠে পাল্টা প্রশ্ন করছি। তোমার রেগে যাবার জন্য নয়। আমি নিজেও বুঝি, তুমি যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু আমি জানতাম তোমার হাতে যোগাযোগের একটা সুযোগ ছিল। তুমি তা করোনি, কিংবা তুমি তা ভাবোনি। তুমি তখন ছোট ছিলে। তোমার মাথায় হয়তো তখন অত বুদ্ধি আসেনি। আমিও যে চেষ্টা করিনি, তা তুমি কীভাবে ভাবলে? অন্তত তোমার মতামত নেয়ার জন্যও বার বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যোগাযোগে ব্যর্থ হয়েছি। আসলে তুমি বিষয়টাকে এক চোখ দিয়ে দেখছো। নিশ্চয়ই তুমি নারীবাদী মহিলাদের দলে নও। অবাস্তব ও বৃথা তর্ক করতে চেয়ো না। সবকিছুকে এক চোখ দিয়ে দেখা ঠিক নয়। প্রকৃতি দুটো চোখ দিয়েছে। সর্বজনীন বা উভয়বাদী হও। এক চোখ দিয়ে নিজেকে দেখো, অন্য চোখ দিয়ে অন্যেরটাও নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করো। সমস্যার সমাধান হবে, শান্তি পাবে। তখন তোমার বয়স কম ছিল, বুদ্ধিও কম ছিল। আমার বয়সও যে বেশি ছিল তা-ও তো না, আমিও তো কম বয়সী ছিলাম। বুদ্ধির পরিপক্কতা তখন আমারও আসেনি। তাছাড়া তোমাকে নিয়ে আমার আবেগ বেশি ছিল। তুমি অন্য জায়গায় চিঠি দিয়েছ শুনলে আমার রেগে যাবারই কথা। আমার শুধু তোমার সাথে একবার দেখা হবার অপেক্ষা ছিল। আমি তোমার মতামত তোমার মুখে জানতে চাইতাম। অন্যকে বিশ্বাস করিনি বলেই তোমার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। তুমি যদি আমাকে বলতে– না, ও-সব মিথ্যে কথা। আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা বিশ্বাস করতাম এবং তোমার সাথে ঘর আমার ঠিকই হতো। আমি তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েও পারিনি। আমি তো তোমাকে কোনোদিনই ফিরিয়ে দিইনি, কটু কথাও বলিনি, তোমাকে নিয়ে কারো কাছে কোনো বাজে মন্তব্যও করিনি। এতে কি কিছু বুঝতে পারো না?’

স্বপ্নার অভিমানটা একটু কমলো বলে মনে হলো। কথাগুলোও স্বাভাবিক হয়ে এলো। মুর্তজা বলে চললেন, ‘সব সময় অন্যকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। আমারো উচিত নয় তোমাকে কথায় কথায় দোষারোপ করা বা দোষ ধরা। তোমার দোষ ছিল কি ছিল-

না বা কতটুকু ছিল তোমার মনই ভালো জানে। না-জেনে তোমার উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়াটা অনুচিত। পারস্পরিক আস্থা না থাকলে সহাবস্থান সম্ভব নয়। পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা সব সময় দরকার। এটাই প্রকৃতির শিক্ষা। নারীবাদী একচোখা তর্কপ্রিয় মহিলারা প্রায় কেউই সুখী নয়। এদের অধিকাংশেরই সংসার ভেঙ্গে গেছে। সেই আদিকাল থেকেই প্রকৃতি নারী-পুরুষ উভয়কেই শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে। উভয়ে উভয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার কারণে কখনো কখনো চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান হয়ে যায়। কিছু কিছু পুরুষ-মহিলা সরলতার কারণে বুদ্ধিতে একটু কম, অথচ নিজেকে খুব বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতি এবং চালাক মনে করে। এদের নিয়েই সমস্যা। এরাই জীবনে বেশি ভোগে। আবার নিজের কৃতকর্মের দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। অক্ষতিকর সত্য কথা সোজাসুজি বলে ফেলাই ভালো। এতে পারস্পরিক আস্থা বাড়ে। অবশ্য মানুষের জন্মগত কিছু স্বভাবের কখনোই পরিবর্তন হয় না। এখন আমার সম্বন্ধে তোমার ভুলটা ভাঙলো কি না বলো?'

'তুমি সন্ধ্যায় কিছু খেয়েছো তো? এ কদিন তোমার চিন্তা আমার মাথা থেকে যাচ্ছে না। আমি স্বাভাবিক হতে পারছিনে। আবার যে কবে দেখা হবে!'

'বলা যায় না, এভাবেই আবার কবে কোথাও দেখা হয়ে যেতে পারে। অত সব ভেবো না। শরীরের দিকে তাকাও। তোমার শরীরের কথা ভাবলে আমার আর কিছুই ভালো লাগে না। তুমি ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো।'

আর অল্প কিছুক্ষণ কথা বলে মুর্তজা ফোন রেখে দিলেন। তিনি বার বার ভাবছেন, স্বপ্না তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়। আর কত দূরে! স্বপ্না তাঁকে নতুন করে কী স্বপ্ন দেখাতে চায়! মুর্তজাও ফিরতে পারেন না। মনে আছে অদম্য ভালোবাসা, প্রথম জীবনের প্রথম প্রেমের ছাপ, গভীর আকুতিভরা আকর্ষণ, যা মোছা দুঃসাধ্য। যদিও বার বার মনের অজান্তে মনে মনে গানের সুর ভেসে আসছে:

'আমায় হারিয়ে যেতে দে আমায় পালিয়ে যেতে দে-এ-এ
পুরাতন মনটাতে আর সয়-না কোনো নতুন জ্বালাতন,
পুরাতন মনটাতে আর সয়-না কোনো নতুন জ্বালাতন ...।'

এক-দুই দিন পরপরই দুজনের কথা হয়। কথোপকথনে কে কেমন আছে, সারাদিন কে কী করলো ইত্যাদিই বেশি প্রাধান্য পায়। একদিন পুরোনো দিনের কথা উঠলো। স্বপ্না বললো, 'একদিনের একটা ঘটনা আমাকে খুব ব্যথা দিয়েছিল। সেদিন থেকেই বুঝেছিলাম যে, তুমি আর আমাকে চাও না এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বাড়ি থেকে

যেখানেই বিয়ে দিক বিয়ে করবো। আমাদের প্রাইমারি স্কুলে স্থানীয় সরকারের ভোট হলো। কয়েক বছর থেকে তোমার দেখা নেই। ঐ দিন আমি একটা নতুন রঙিন শাড়ি পরে সাজগোজ করে স্কুলে এলাম। এসে দেখি তুমি দু-একজনের সাথে ভোটকেন্দ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছো। পশ্চিম পাশের শেষ রুমটাতে মহিলাদের ভোট চলছে। আমি আমার বান্ধবীকে নিয়ে মহিলাদের ওখানে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম। সেদিন আমাকে খুব সুন্দর লাগছিল। আমি ভাবছিলাম, তুমি আমার দিকে তাকাবে, আমাদের কথা হবে। তুমি তাকালে না। আমি ভাবলাম, তুমি ইচ্ছে করে আমাকে দেখেও না-দেখার ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে আছো। কিছুক্ষণ পর আর ভালো লাগলো না। বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি এসে অনেক কেঁদেছিলাম। ঐ দিন থেকে তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'তুমিও ঐ দিন দারুণ একটা সুযোগ হাতছাড়া করেছিলে। ঐ একদিনের দেখাতেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাবার সম্ভাবনা নব্বই ভাগ ছিল। তুমি তো কোনোভাবে কোনো অজুহাতে আমার সামনে আসতে পারতে। এগিয়ে এসে আমার সাথে কথা বলতে পারতে অথবা আমাকে দেখা দিতে পারতে। আমার সাথে চোখাচোখি হলে আমি যদি চোখ ফিরিয়ে নিতাম, কথা না বলতাম, তাহলে তুমি দুঃখ পেতে পারতে। তুমি যে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারো, এটাই তো আমার চিন্তায় আসেনি। তুমি জানো, আমি মেয়েদের দিকে কম তাকাই। তুমি ছিলে মেয়েদের কাউন্টারের ওদিকে। ছেলেদের ভোট হচ্ছিল পূর্বদিকের রুমগুলোতে। তাছাড়া তুমি বরাবরই সালোয়ার কামিজ পরো, ঐ দিন নাকি পরে এসেছো শাড়ি, আমি হয়তো ভাবতেই পারিনি শাড়ি পরিহিতা তোমার কথা, তাই ওদিকে ভালো করে তাকাইনি। আমার চোখ তোমাকে এড়িয়ে গেছে। তুমি আমার সাথে দেখা করার চেষ্টা করতে পারতে। তারপর তোমাকে উপেক্ষা করলে অভিমান, রাগ বা দুঃখ করতে পারতে। তুমি এটা কীভাবে ভাবলে যে, আমি তোমাকে দেখে না-দেখার ভান করেছি? তোমার সাথে তো এর আগে কখনো কোনো মনোমালিন্য হয়নি, মাধ্যমের অভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল মাত্র। এতটা বছর পর আজ আমি শুনছি, তুমি ঐ দিন ভোটকেন্দ্রে এসেছিলে। আমাদের ছেলেমোপনা চিন্তাধারা আমাদের একত্র হবার পথের অন্তরায় হয়েছে। সেই প্রথম থেকে দেখে আসছি, তুমি সবকিছু নিয়েই উল্টোটা ভাবো, চিন্তাধারা উল্টো, বুদ্ধিও উল্টো— ভোগান্তিটা আসে উভয়েরই ঘাড়ে। আজ তোমার এই বলা ঘটনায় ও কথায় আমি খুব কষ্ট পেলাম। এখন থেকে আমি তোমাকে 'উল্টোডাঙ্গা' বলে ডাকবো। এ নিয়ে আর বেশি কথা বলো না, আমার মনটা আরো খারাপ হয়ে যাবে।' মুর্তজা আফসোসের সাথে কথাগুলো বললেন।

দিন এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই দুজনে কথা বলে। প্রায় ছয় মাস হতে চললো। একদিন স্বপ্না ফোন করে খুব আবেগতাড়িত হয়ে বললো, 'গত রাতে আমি এমন

একটা স্বপ্ন দেখেছি না! তোমাকে বলা দরকার। দেখছি কী! আমরা দুজনেই যেন সেই আগের বয়সী। আমি একটা রঙিন নতুন শাড়ি পরে রান্নাঘরে রান্না করছি। তুমি যেন কোথা থেকে এলে। আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়ালাম। তোমাকে সেই আগের মতো দেখলাম।'

মুর্তজা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, তারপর বললেন, 'তুমি তো অনেক স্বপ্নই দেখছো। আমিও শুধু রাতেই নয়, দিনেও অনেক স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু চিন্তাভাবনার কোনো কূলকিনারা করে উঠতে পারছিনে। জানিনে, এ চিন্তার শেষ কোথায়!'

'আচ্ছা, আমি যদি তোমার কাছে চলে আসি, তাহলে তুমি কি আমাকে নেবে?' স্বপ্নার সহজ-সরল প্রশ্ন।

'তুমি ভাবলে কী করে, তুমি চলে এলেই আমি তোমাকে নিয়ে নেবো?'

'আমি জানি, তুমি আমাকে চাও না, তুমি আমার সাথে অভিনয় করছো। তুমি আমাকে আজীবন কষ্টে রেখেছো। বেশ রাখলাম।'

স্বপ্না ক্ষোভের সাথেই ফোনটা রেখে দিল। মুর্তজা রিং ব্যাক করলো, স্বপ্না ফোন ধরলো না। মুর্তজা বুঝলেন, স্বপ্না আশাহত হয়েছে, তাঁর সোজাসুজি উত্তরে খুব কষ্ট পেয়েছে। এখন তাঁর উপর রেগে আছে। তাঁর এভাবে কথাটা বলা উচিত হয়নি। আরো বুঝিয়ে বলতে হতো। স্বপ্নার এই না-বুঝ সরলতা মুর্তজার কাছে খুব ভালো লাগে। কিন্তু স্বপ্না রেগে গেলে তো দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কী বলতে থাকে, সে নিজেও পরে ভুলে যায়। তাকে নিয়ে এই একটা অসুবিধা।

মুর্তজার কাছে স্বপ্না খুব সহজ-সরল। কিন্তু রেগে গেলে বাঘ। মুখের কাছে টেকা কঠিন। নিজেই বলে যাবে। কারো কোনো কথা শুনবেই না, কানেই তুলবে না।

তিন দিন কোনো যোগাযোগ নেই। মাঝে একদিন মুর্তজা ফোন করেছিলেন। স্বপ্না শুধু 'তুমি কেমন আছো, আমি ভালো আছি' ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত দু-একটা কথা বলে রেখে দিয়েছিল। মুর্তজা বুঝেছিলেন, স্বপ্না স্বভাবিক হতে পারছে না।

আজ মুর্তজা ফোন করলেন। স্বপ্না ফোনটা ধরেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিলাপ শুরু করে দিল, 'তোমাকে ফোন করে ভুল করে ফেলেছি। তুমি কি মনে করো, ঐ লোকটার ভাত কম পড়ে গেছে? তার অনেক আছে। ভাতের জন্য কারো দরজায় আমার যাবার দরকার নেই। তুমি ভাবলে কী করে যে, তুমি বললেই আমি এখনই তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব? আমাকে তুমি আজীবন অবহেলা করেছো। এখন বুঝছি, তুমি তখনও আমাকে চাওনি। তুমি ভালো আছো, ভালো থাকো। আমি তোমার সুখের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করতে যাচ্ছিনে'— এমন অনেক কথা।

মুর্তজা শুধু 'প্লিজ একটু থামো, আমি যা বলি একটু শোনো, আমাকে বোঝার চেষ্টা করো' ইত্যাদি বলতে লাগলেন। স্বপ্না মুর্তজার কোনো কথা না-শুনে লাইন কেটে দিলো।

মুর্তজা সন্ধ্যার পর আবার ফোন করলেন। স্বপ্না ফোন ধরলো। তাকে এবার ধীর, ভাবগম্ভীর ও অভিমানী মনে হলো। তিনি বললেন, 'প্লিজ, স্বপ্না আমাকে ভুল বুঝো না। আমি যা বলছি একটু মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। আমি বলছিনে যে, আমি তোমাকে নেবো না বা চাইনে। কিন্তু বাস্তবতাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। বাস্তবতার এ জায়গাটাতে এত আবেগপ্রবণতার কোনো স্থান নেই। তুমি আসতে চাইলে আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি বরং সুখী হব। কিন্তু উভয়ে বসে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা দরকার। তুমি কীভাবে কী করতে চাও, তোমার মনোভাবটা খোলাখুলিভাবে আমাকে বলো। এতে আমি তোমাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারি কী-না দেখি। বিষয়টাকে এত হালকাভাবে নিলে শেষে দুজনকেই হাজতে উঠতে হবে এবং পত্রিকার খবরের শিরোনাম হতে হবে। এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তুমি তোমার পরিকল্পনাটা অনেক ভেবে আমাকে বোলো। প্রয়োজনে আমি একজন আইনজীবীর সাথে কথা বলবো, নইলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে। এই বয়সে এসে আমরা কোনো হালকা কাজ করতে পারিনে।'

'আচ্ছা, আমাকে দশ দিন সময় দাও, আমি সব বলবো। আমার আর এক মুহূর্ত এই বাসাতে থাকতে ইচ্ছে করে না। ঐ লোকটার সাথে বসবাস করতেও ইচ্ছে করে না। আজ কয়েক দিন থেকে কথাও বন্ধ। মেয়ের মাধ্যমে সংসারের কেনাকাটার কথা বলি।'

স্বপ্না প্রায়ই হাজি কেরামতের অমঙ্গল হোক, সে-ইচ্ছা উচ্চারণ করে মুর্তজাকে শোনায়। 'আর যেন বাড়ি ফিরে না আসে, তার মুখ যেন আর না দেখতে হয়', এসব বলে। মুর্তজা ভাবেন, হয়তো কোনো বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে মনকষাকষি হয়েছে, এখন রেগে আছে, তাই বলছে। মুর্তজা বলেন, 'কারো অমঙ্গলের ইচ্ছা এভাবে প্রকাশ করা ঠিক নয়। কারো অমঙ্গলের ইচ্ছা মনে পোষণ করা মানে নিজের মানসিক পরিশুদ্ধতাকে কলঙ্কিত করা। ওভাবে বলতে হয় না।'

স্বপ্না এ অমঙ্গলের কথা মন থেকে বলে, নাকি মুর্তজার মন জয় করার জন্য বলে, তিনি ভেবে পান না।

স্বপ্নার কথাগুলো শুনে মুর্তজা মর্মাহত হলেন। ওর জন্য তিনি কীই-বা করতে পারেন! ওকে একটু মানসিক শান্তিতে রাখার ব্যবস্থাও তো তাঁর জানা নেই। সত্যিই ও খুব কষ্টে আছে! মুর্তজার মনটা বিগলিত হয়ে গেল। এ অশান্তি থেকে স্বপ্নাকে উদ্ধার

করার বুদ্ধি বের করতে চান মুর্তজা। স্বপ্নার চিন্তায় রাতে তাঁর ঘুম নেই। এসব অনেক কথাই স্বপ্নাকে মুর্তজা বলেন না, যদিও এমন চিন্তা সব সময় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় মুর্তজার শরীরটা এক মাসে বেশ খারাপ হয়ে গেছে। তিনি খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো করেন না। সব সময় কী যেন একটা ভাবেন। তিনি যে জীবনে উভয় সংকটে পড়েছেন, তা বুঝতে পারছেন। শেষ বয়সে এসে স্বপ্নার চাওয়া-পাওয়া ও কষ্টকে আন্তরিকভাবে নিচ্ছেন মুর্তজা। তাঁর চিন্তা, স্বপ্নাকে কীভাবে সুখী করা যায়।

দু-একদিন পরপরই দুজনে কিছু সময় ধরে কথা বলে। দিন পনেরো পরে একদিন মুর্তজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, আমাদেরকে নিয়ে কোনো পরিকল্পনা কি কিছু করতে পারলে?'

'না, অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু সঠিক পরিকল্পনাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারছিনে। আমি আরো ভাবি, তারপর সব তোমাকে বলবো।'

'তুমি যদি পরিকল্পনাটা সাজাতে না পারো, তো সংক্ষেপে পয়েন্টগুলো লিখে ফেলো। পরে আমাকে পড়ে শুনিও।' মুর্তজা বললেন।

'আচ্ছা তা হবে। আমি ভাবছি মেয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা আর তিন মাস বাকি। এই তিন মাস পরই একটা সিদ্ধান্ত আমি নিয়ে ফেলবো। তুমি আমাকে আর তিনটা মাস সময় দাও।'

মনে হচ্ছে স্বপ্না সংসার ছেড়ে দেবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার কথার সুরে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মুর্তজা স্বপ্নাকে জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে নারাজ। তার চিন্তার স্বাধীনতা দিতে চান মুর্তজা। তবে সে যেটাই করুক মুর্তজার সাথে পরামর্শ করে করুক— তিনি এটাই চান। স্বপ্নার সুখই তাঁর সুখ।

মুর্তজা নিজেও জানেন, এই বয়সে স্বপ্নার সংসার ছেড়ে চলে আসাটা এতো সহজ নয়। একদিন কথায় কথায় মুর্তজা স্বপ্নাকে দুটো বিকল্প প্রস্তাব দিলেন। 'তুমি চলে আসবে কী আসবে না, এ সিদ্ধান্তের বিষয়টা তোমার উপর থাকলো। তবে বিকল্প এ-ও হতে পারে যে, যেভাবে আমরা সংসার চালিয়ে যাচ্ছি, সেভাবেই চলবো। একে অন্যের খোঁজখবর রাখবো, আপন ভাববো, বিপদে পাশে দাঁড়াবো, মাঝেমধ্যে ফোনে যোগাযোগ হবে।'

স্বপ্না কোনোমতেই বিকল্প প্রস্তাবে রাজি নয়। তার কথা, 'তোমার সুখের সংসার তুমি ঠিক রাখতে চাও, এই তো? শেষ জীবনে এসে যেহেতু তোমাকে পেয়েছি, ঘর আমাদের হবেই। যদি তুমি আবার আমার সাথে বেঈমানি না করো।'

মুর্তজা বললেন, 'তুমি এলে তোমাকে আমি কোনোদিনই ফেরত দেবো না। যতদিন বাঁচি তোমাকে মাথায় তুলে রাখবো। তবে তুমি মন খুলে সঠিক তথ্যটা আমাকে যথাসময়ে দেবে। আমি বেশি ঘোরপ্যাঁচ বুঝিনে, এ-তো তুমি জানো।'

স্বপ্না বললো, 'তুমি জানো না, কেরামতের এ সংসারে থাকতে আমার আর একদণ্ডও মন চায় না। আমার কষ্টের খবর তুমি জানো না। ওর প্রতি আমার কোনো দয়া-মায়া নেই। ও মরে গেলেই বাঁচি।'

মুর্তজা স্বপ্নাকে এ-ধরনের কথা আবারো বলতে নিষেধ করলেন।

মুর্তজা বিদেশের একটা ট্রেনিংয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। অনেক দিনের প্রত্যাশিত ট্রেনিং। তিনি খুব উল্লসিত। খবরটা স্বপ্নাকে না জানানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছেন না। স্বপ্নাকে ফোন করলেন। কথায় কথায় বললেন, 'তোমার জন্য একটা সুসংবাদ আছে। আমি অনেক দিন থেকে বিদেশে একটা ট্রেনিংয়ের জন্য চেষ্টা করছিলাম। সুযোগটা পেয়ে গেছি। এ মাসের শেষের দিকেই যেতে হবে।'

স্বপ্না মুর্তজার এ ট্রেনিংয়ের সংবাদে কোনো সাড়া দিল না, কোনো আনন্দও প্রকাশ করলো না। যেভাবে কথা বলছিল সেভাবেই কথা বলতে থাকলো। অন্য প্রসঙ্গ আলোচনায় নিয়ে এলো।

বেশ কিছুদিন থেকে স্বপ্না কথা বলে কিন্তু মুখে কোনো হাসি নেই। বিষয়টা মুর্তজাকে ভাবিয়ে তুললো। ট্রেনিংয়ে যাবার আর মাত্র চার দিন বাকি। স্বপ্না কোনো ফোন করছে না। ফোন ধরছেও না। মুর্তজা অস্বস্তিতে ভুগছেন।

আজ রাতে ফ্লাইট। মুর্তজা সন্ধ্যায় স্বপ্নাকে ফোন করলেন। স্বপ্না প্রথমত স্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। কান্নায় ভেঙে পড়লো।

'তোমাকে আমি অনেক সাধনার বলে শেষ জীবনে এসে পেয়েছি। তুমি আমাকে প্লিজ ছেড়ে যেও না। আমার কথাটা শোনো, আমাকে ভুলে যেও না। তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চিন্তা করতে পারিনে। তুমি আমাকে আর ফাঁকি দিও না, প্লিজ। আমি জানি তুমি বিদেশে গেলে আর ফিরে আসবে না। এ দেশ থেকে ঐ-সব দেশে গেলে কেউ ফিরে আসে না। আমি তোমাকে হারাতে চাইনে। আমার সমস্ত স্বপ্নকে তুমি ভেঙে চুরমার করে দিও না, প্লিজ। আমার কথাটা রাখো। আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। তুমি যেদিন বিদেশে যাবার কথা বলেছো, সেদিন থেকে আমার মুখে হাসি ফুরিয়ে গেছে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, তুমি জেনো।'

স্বপ্না আর কোনো কথা বলতে পারলো না, হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিল। তার কান্নায় বাঁধ মানছে না, কেঁদেই যাচ্ছে। মুর্তজার মনের অবস্থাও আজ ভালো না। তিনি

নির্বাক হয়ে স্বপ্নার এ বিলাপ শুনতে থাকলেন। শেষে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'আমার কথাটা একটু শোনো, প্লিজ। আমি বিদেশে কখনোই থেকে যাব না। ট্রেনিং শেষে অবশ্যই ফিরে আসবো। আমাকে বিশ্বাস করো। আর একদিন পর থেকেই প্রতিদিন কমপক্ষে আধাঘণ্টা করে তোমার সাথে ফোনে কথা বলবো, কেমন? তুমি বিশ্বাস করো। দুদিন পরেই বুঝতে পারবে। আমি কথা দিলে অবশ্যই কথা রক্ষা করবো। মাত্র দুদিন ধৈর্য ধরে দেখো। আমি মিথ্যে বলছি কি-না সব প্রমাণ হয়ে যাবে। আমার জন্য মন থেকে দোয়া করো, আমি যেন ভালোভাবে ফিরে আসতে পারি।'

রাত সাড়ে বারোটায় এয়ারপোর্ট থেকে স্বপ্নার সাথে মুর্তজার আবার ফোনে কথা হলো। ফ্লাইট টেক-অফ করার সময়ও তিনি আরেকবার ফোনে স্বপ্নার কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং দোয়া চাইলেন। মুর্তজার মনের রেকর্ডে একটা গানের সুর অবিরাম বাজতে থাকলো, 'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরেই আমি ধাই, কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

ট্রেনিং চলাকালীন প্রতিদিন মুর্তজা ফোন করেছেন। স্বপ্না কেমন আছে খোঁজখবর নিয়েছেন, খোশগল্প করেছেন। বিদেশের শহরে খাওয়া-দাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা ফোনে স্বপ্নাকে দিয়েছেন। স্বপ্না আস্থা ফিরে পেয়েছে। মুর্তজা কবে ফিরে আসবেন, স্বপ্না দিন গোনা শুরু করে দিয়েছে। স্বপ্না এও বলেছে, 'তুমি ফিরে আসার পরপরই আমরা নতুন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এসো।' মুর্তজার কথা, 'তুমি যাতে খুশি, আমিও তাতে খুশি। তবে কী করতে যাচ্ছ আমাকে একটু আগে আগে জানিও, যাতে আমি প্রস্তুতি নিতে পারি।' স্বপ্না বলেছে, 'আচ্ছা তা হবে। আগে তুমি এসো।'

বেশ কিছুদিন হলো মুর্তজা দেশে ফিরেছেন। স্বপ্নার সাথে নিয়মিত কথা হয়। মুর্তজা প্রায়ই বলেন, 'তুমি একটু চেষ্টা করে ঢাকায় এসে বেড়িয়ে যাও। কোনো-না-কোনোভাবে দেখা হবে। ভালো লাগবে। আর সামনাসামনি আমাদের বিষয় নিয়ে কথা হবে।'

স্বপ্না বলে, 'চেষ্টা করছি, সুযোগ করে উঠতে পারছিনে। তোমার মুখখানা দেখার আমারো খুব ইচ্ছে।'

'দেড়টা বছর হয়ে গেছে তোমার সাথে দেখা হয়েছে। এখন আমাকে দেখে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। অনেকেই বলছে, এই লোকটাই যে আগের সেই লোকটা, দেখলে নাকি চেনাই যায় না। কেন এমন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমার শরীরটা কেন জানি ভেঙেই যাচ্ছে। ইদানীং বুকে মাঝেমধ্যে বেশ ব্যথা করছে। বুকের অসুখের উপরে তো ভরসা করা কঠিন। এই ভালো, এই মন্দ। কোলেস্টেরল অনেক

বেশি। প্রেসারও বেশি। ওষুধ খাচ্ছি। দেখি, কতদূর উপকার হয়। ডাক্তারের কাছে গেলেই বার বার দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে। কিন্তু তুমিই বলো, আমার পক্ষে কি দুশ্চিন্তা বন্ধ করা সম্ভব? তাছাড়া, এ বয়সে শরীর একবার ভেঙ্গে গেলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা কষ্টসাধ্য। দেখি কী হয়? তোমার জন্য হলেও তো আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমার না তোমার জন্য অনেক দিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে! তোমাকে আমি কোথায় রাখবো বলো তো? আমি যে তোমাকে রাখার নিরাপদ কোনো জায়গা খুঁজে পাইনে!' মুর্তজা আবেগাপ্লুত হয়ে অনেক কথাই বলে যান।

৭.

আজ সকাল থেকেই মুর্তজার শরীরটা ভালো লাগছে না। কলেজে যাননি। ভাবছেন, পরে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে নেবেন। চারতলার ছাদে সেই চিলেকোঠার ঘরটাতে নিঃসঙ্গ শুয়ে আছেন। দুপুর বারোটার দিকে মনে হলো একবার স্বপ্নাকে ফোন করবেন। ফোন বন্ধ। ভাবলেন, স্বপ্না তো সাধারণত ফোন বন্ধ রাখে না। কী হলো? বেশি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো কি-না। দুপুর তিনটার দিকে আবার ফোন দিলেন। স্বপ্না ফোন ধরলো।

'সকাল থেকে কোথায় গিয়েছিলে? ফোনটাও বন্ধ ছিল!'

'পাশের বাসার ভাবীদের সাথে তবলিগের আখেরি মোনাজাতে গিয়েছিলাম।'

'জেলা পর্যায়ে আবার তবলিগের ইস্তেমা হয় নাকি? এ তো আগে কখনো শুনিনি। ঢাকায় টঙ্গীতে বাৎসরিক ইস্তেমা হতে শুনেছি। মানুষের ঢল নামে। সামাল দিতে না পেরে এখন দু ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। কিন্তু জেলা পর্যায়ে সমাবেশের কথা তো কোনোদিন শুনিনি।' মুর্তজা আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'এবার এখানে বড় মাঠের মধ্যে বেশ বড় করে আয়োজন করেছে। শেষ দোয়া মাহফিলে মোনাজাতের জন্য গিয়েছিলাম। বিশাল আয়োজন, প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল।'

'আচ্ছা, প্রতিবেশী ভাবীদের সাথে তো গিয়েছিলে, তুমি আজ ফজরের নামাজ পড়েছিলে?'

'শরীরটা খুব একটা ভালো না। ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারিনি।' স্বপ্না লজ্জাবনত কণ্ঠে উত্তর দিল।

'এ নিয়ে আমার কিছু কথা আছে। মাস্টার মানুষের সব কথা আবার সবার ভালো লাগে না। তোমার কি ভালো লাগবে? তোমার শোনার আগ্রহ আছে কি-না তাও তো জানিনে। তাছাড়া, মাস্টার মানুষরা কথা বলে অভ্যস্ত, শুনতে অভ্যস্ত নয়। আর

মাস্টার মানুষের বক্তৃতা শুরু হলে শেষ হতে চায় না। তুমি তো জানো, মাস্টারি বক্তৃতা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে, আর তোমার কাছে। একটা সুবিধা হলো দু পক্ষের কেউই কোনো প্রতিবাদ করে না। তাই যা ইচ্ছে বলা যায়।'

'বলো না শুনি, তুমি কী বলতে চাও বলো। আমার মোনাজাতে অংশ নেয়া নিয়ে বলবে, এই তো?'

মুর্তজা বলে চললেন, 'টঙ্গীর ইস্তেমা মাঠে কত লক্ষ লোকের সমাবেশ হয় তা আমরা কেউই সঠিক জানিনে, অনুমান করি। বেশি জমায়েত হয় শেষ দিনের সকাল থেকে আখেরি মোনাজাত পর্যন্ত। এতে থাকে প্রকৃত মুসলমান, সরকারি-বেসরকারি নেতা-নেত্রী, গোলাম-বিবি, ঘুষখোর, সুদখোর, টাউট, পকেটমার, জুতোচোরসহ আপামর সাধারণ মানুষ। পরের দিন নেতা-নেত্রীদের মোনাজাতের ছবি পত্রিকায়ও ছাপা হয়। ঐ রাতের টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়। দেশটা টাউট, বাটপার, ঠগবাজ, ধোঁকাবাজ, প্রতারক ইত্যাদিতে ভরপুর; আবার আখেরি মোনাজাতে গিয়েও জায়গা পাওয়া কঠিন। আমি এমনও দেখেছি, কেউ একজন মোনাজাতের জন্য হাত উঠিয়েছে, মোবাইল ফোনে কল এসেছে। এর মধ্যেই বলছে, 'এই, আমি আখেরি মোনাজাতে এসেছি, এখনই ফিরে আসছি, তোমরা আমার অংশটা রেখো। আমার অংশ না পেলে আমি ফাইল ছাড়বো না।' আমরা সব সময় মূলটাকে বাদ দিয়ে সহজ পথের সন্ধান করি। জেনেশুনে পাপ কাজও করি। আবার কীভাবে সহজে হড়াৎ করে বেহেস্তে চলে যাওয়া যায়, সে-বুদ্ধিও করি। বর্তমানে বাঙালির মতো চতুর জাতি পৃথিবীতে দুর্লভ। সবুজ রঙের পাসপোর্ট হাতে নিয়ে বিদেশে যেতে চাইলে অন্যান্য দেশের বিমানবন্দরের ভোগান্তি দেখলেই বোঝা যায়, অন্যরা আমাদের কত সুনজরে দেখে। আগে মানুষ সহজ সরল ছিল। এ দেশের কুটিল বুদ্ধির রাজনীতিবিদরাই মানুষকে জটিল বুদ্ধি ও দুর্নীতির ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে আজ এ-পর্যন্ত এনেছে। সমাজটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। সমাজে দুর্নীতিবাজে ভরে গেছে। আচ্ছা তুমিই বলো তো— নামাজ বড় না মোনাজাত বড়?'

'কেন, নামাজ বড়।' স্বপ্না কোনো কিছু না ভেবেই বললো।

'যারা প্রকৃত তবলিগি, তারা দু-তিন দিন ধরে যারপরনাই কষ্ট করে বয়ান শুনেছে এবং বাস্তব জীবনে তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। আর একটা বৃহৎ শ্রেণি সহজ পথে বেহেস্ত পাবার আশায় মোনাজাতে শরিক হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ দিয়ে আগের কাতারে শামিল হচ্ছে। অফিস ফাঁকি দিচ্ছে। কোথাও জায়গা না পেয়ে লোকসমাবেশ এয়ারপোর্টের অনেক দক্ষিণেও চলে আসে। এলাহি কাণ্ড। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং অফিস-আদালতের এই সংখ্যক লোকও যদি এদেশে ভালো হতো, নীতিবান

হতো, ভালো পথে চলতো, ইসলামের আনুষ্ঠানিকতা পালনের তুলনায় মূল নীতিমালা মেনে চলতো, তাহলে দেশের উন্নয়ন ও শান্তি অনেক অনেক আগেই হতো।'

'কেউবা গুরু ধরে গুরুর মাধ্যমে বেহেস্তে যেতে তৎপর। এছাড়া বেহেস্তে যাবার আরো সহজ পথ কেউ কেউ খুঁজে নিয়েছে। ধর্মের নামে উগ্রবাদী হয়ে বোমা ফাটিয়ে কিছু সাধারণ মানুষ, নারী-শিশু মারতে পারলেই একবারে শহীদের মর্যাদা পাওয়ার দরজা খুলে যায়, হড়াৎ করে বেহেস্তে যাওয়া যায় বলে এদের ধারণা। এদের অধিকাংশেরই রাষ্ট্র কাঠামো ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আবার ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞানও নেই। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বোমা মেরে কয়েকজন বিচারককে হত্যা করলেই যে বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন হয় না, এতটুকুও বোঝে না। একজন বিচারক মারলে আর একজন বিচারক আসবে। শত শত বিচারক মরলে আবার নতুন করে শত শত বিচারক নিয়োগ পাবে, কিন্তু বিচারব্যবস্থার তো পরিবর্তন হবে না। এ বোধটুকুও নেই। আইন কীভাবে তৈরি হয়, কীভাবে পরিবর্তন হয়, এর সামান্য জ্ঞানটুকুও নেই। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চায়। এভাবে অশান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে যে কোনোদিনই দেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন এবং দেশের শান্তি ও উন্নয়ন সম্ভব নয়, এ বোধেরও বড্ড অভাব। এদের চিন্তাধারা ও কাজ-কারবারগুলো অতি জঘন্য। অবশ্য এদের একটা গুণ আছে— এরা মিথ্যা বলে না, মানুষকে শোষণ করে না। অজ্ঞতাবশত কারো প্ররোচনায় সংক্ষিপ্ত পথে পরকালে বেহেস্ত এদের মূল টার্গেট। ইহকালের জ্ঞান খুব কম। সমাজবিজ্ঞান নেই, সমাজদর্শন নেই, ইতিহাস নেই, মনোবিজ্ঞান নেই, সত্য বিশ্লেষণের ক্ষমতাও এদের নেই। মূলত ইসলাম ধর্মকে নিয়ে খেয়ালখুশিমতো খেলা শুরু হয়েছে। মতেরও অভাব নেই, পথেরও অভাব নেই। এরা ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলামকে একটা সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে পরিচিত করাচ্ছে। এদের কোনো মতবাদ থাকলে তারা সাধারণ মানুষের কাছে ভালোভাবে তাদের আদর্শ পৌঁছে দিয়ে মানুষকে তাদের পথে আনতে পারে। সমাজে ইসলামের অনুসরণীয় কর্ম দেখিয়ে মানুষের মন আকৃষ্ট করতে পারে। তা না করে আজীবনের সৎকর্ম ছাড়া উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে সহজ পথে বেহেস্তে যেতে তৎপর। আমি বিশ্বাস করি, উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে এদের পথে আনা সম্ভব।'

'প্রকৃত কথা হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাম বলছি মুসলমান। ধর্ম কী? ইসলাম (শান্তি)। চিন্তা করছি অশান্তির, কাজ করছি অশান্তির, আবার প্রতিষ্ঠা করতে চাই শান্তি। বিপরীতমুখী এ চাওয়া-পাওয়ার সমীকরণ মেলানো কীভাবে সম্ভব? মানসিকভাবে মুসলমান হচ্ছিনে, পথ ও পাথেয় অনুপস্থিত, আনুষ্ঠানিক মুসলমান— কর্ম ও চিন্তায় মুসলমানিত্ব নেই, নামে মুসলমান। মূল সমস্যাটাই এখানে। তুমি কাজী নজরুলের একটা গান নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, আমরাও ছোটোবেলায় শুনতাম—

‘আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান? কোথা সে মুসলমান? কোথা সে আরিফ, অভেদ যাহার জীবন-মৃত্যু-জ্ঞান’ ... ।’

‘আবার বেহেস্তে যাবার জন্য বোমাবাজ দলের তুলনায় দেশীয় অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা আরো ভয়ঙ্কর। এরা বোমাবাজিও করে, মানুষকে শোষণও করে, দিনে-দুপুরে মানুষ গায়েবও করে, কিরিচ-রামদার প্রশিক্ষণ নেয়, আবার সবিস্ময়ে ডাহা মিথ্যাও বলে। কেউ কেউ বেহেস্ত যেতে বার বার হজও করে। ইস্তেমার মাঠে শেষ দিন মোনাজাত ধরে বসে থাকে। ক্ষমতা ও কুটিল বুদ্ধির দাপটে সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবে। এরা রাজনীতির নামে এদেশের লক্ষ লক্ষ যুবকের চরিত্র ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষকে অমানুষ বানাচ্ছে, বিপথে নিচ্ছে। মানুষকে হাতে-কলমে দুর্নীতি শেখাচ্ছে, অন্যায়কারী ও দুর্নীতিবাজদের ছত্রছায়া দিচ্ছে, নিজেরা সন্ত্রাসের কাজ করছে ও সন্ত্রাসী পুষছে। বেহেস্তলোভী বোমাবাজ দলের কোনো লোকের বিচারে একবার ফাঁসি হলে এ-জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের আইনত দশবার ফাঁসি হওয়া উচিত। এদের ফাঁসি সহজে হয়ও না। বিচারালয় ফাঁসি দিলেও ফাঁসি ঘোরানোর লোক এদের হাতে থাকে। তাই সাত খুনের সন্ত্রাসী মাফ পেয়ে যায়, ‘মুলো চোরের ফাঁসি’ হয়। আবার কুখ্যাত চোর ও সন্ত্রাসীরা নেতাদের সাথে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। এ-এক আজব তরিকায় চলা দেশ। আজব এ জনগোষ্ঠী। আজব এদের চিন্তাধারা ও রুচি।’

‘তোমার এ বক্তৃতা শুনতে আমার আর ভালো লাগছে না। নতুন কিছু বলো।’

মুর্তজা বললেন, ‘এদেশে ধর্মের মাধ্যমে বেহেস্তে যাবার সংক্ষিপ্ত পথই শুধু আবিষ্কৃত হয়নি, ধর্মসভা চুরি পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে। সে খবর কি তুমি রাখো?’

‘সে আবার কেমন চুরি?’ স্বপ্না বললো।

মুর্তজা বলে চললেন, ‘এটা পুকুর চুরি ধাঁচের একটা চুরি। ‘পুকুর চুরি’ বাগ্‌ধারার বাস্তব ঘটনাটা জানো তো? এটারও একই প্রেক্ষাপট। আমার এক সহকর্মীর কাছে সেদিন শুনলাম। ইন্টারনেটের খবরে এবং পেপারে নাকি এসেছে। বিভিন্ন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকারের বাজেট বরাদ্দ থাকে। বরাদ্দের পরিমাণও কোটি কোটি টাকা। ভুয়া নাম ও ভুয়া সভা দেখিয়ে এই কোটি কোটি টাকার বাজেটও নাকি গায়েব হয়ে যাচ্ছে। টাকা কোষাগার থেকে ঠিকই উঠানো হচ্ছে, ডকুমেন্ট সই-স্বাক্ষর সবই থাকছে। সভা হয়েছে কাগজে দেখানো হচ্ছে, অথচ ধর্মসভাটাই গায়েব হয়ে গেছে। টাকা উঠিয়ে যার যার পকেটে চলে গেছে। এদেশের রাজনৈতিক দলের ‘সোনার ছেলেরা’ তো আর এমনিতে দলের পিছ পিছ ঘোরে না, তাদেরকেও তো কিছু আর্থিক সুবিধার উচ্ছিষ্ট ছিটিয়ে জিইয়ে রাখতে হয়। বাকিটা তারা নিজেই

অভিনব কায়দায় নতুন নতুন আয়ের উৎস তৈরি করে করে-কম্মে খেতে পারে। এমনই ধর্মসভা চুরি ছাড়াও কত অধর্ম-সভার বাজেটও যে ভাগ-বাটোয়ারা হচ্ছে, তার অতি নগণ্য সংখ্যক তথ্যই আমরা জানি। দৈনিক পত্রিকার দিকে একটু নজর রাখলেই সব চোখে পড়ে। বাকিটা অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান করে নিতে হয়। আমার বিশ্বাস, হাজি কেরামত সরকার বড় বড় দান মারে, এসবের মধ্যে যায় না। তাই তুমিও এগুলোর খবর রাখো না।'

'তুমি সবকিছুর মধ্যেই ঐ লোকটাকে টানো কেন? এসব রাখো। বিদেশের গল্প করো।'

স্বপ্না মুর্তজার এ বস্তাপচা বক্তৃতায় আদৌ আনন্দ পাচ্ছে না।

মুর্তজা বললেন, 'বুঝি, তোমাদের চিন্তাধারা সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখো, ফলে এসব বক্তৃতায় উৎসাহ পাও না। আর হাজি কেরামতের আলাদিনের চেরাগের খবর বেশ জানো— এর বাইরে নয়। তুমি শুধু আমাদের কথা বলতে দুজনের কথাই ভাবো। আসলে আমরা আমাদের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ ও দেশকে আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারিনে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ-সব কিছুরই প্রভাব আছে। এখন বিদেশের কথাই বলছি, শোনো— বিদেশে আমাদের ট্রেনিং সেন্টারের পাশের এলাকায় ছোট একটা বাজার ছিল। সেখানে ছোটোখাটো জিনিসসহ ফলমূল কিনতে প্রায়ই যেতাম। স্থানীয়রা বাংলা জানে না, ইংরেজিও না। একদিন হাতের ইশারায় এক দোকানিকে কিছু ফল বেছে বেছে দিতে বললাম। সে তার দোকানের ফলগুলো থেকে চারটা ফল বেছে বেছে প্যাকেটে ভরলো, পাশের দোকান থেকে বেছে বেছে আরো কয়েকটা এনে প্যাকেটে ভরলো। আমি নিজে না নিয়ে যেহেতু তাকে দিতে বলেছি এবং ভালোগুলো দিতে বলেছি, সেজন্য নিজের দোকানের খারাপ ফলগুলো আমাকে আদৌ দিল না। এটা এ দেশের জন্য আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি? এক সময় এদেশের দোকানিরাও এমনটাই ছিল। কী জানি কোন কুটিলতার বাতাস এদের গায়ে লাগাতে এরা এত চতুর ও প্রতারক হয়ে গেছে যে, যতবার দোকানে মাংস কিনতে যাই ততবারই তারা হাতের কারসাজিতে মাংস-কাটা-কাঠের ভিতরের পাশে রাখা নিম্নমানের মাংস ভালো মাংসের সাথে মিশিয়ে আমাকে দেবেই। ফলবিক্রেতা খারাপ পচা ফলটা আমার প্যাকেটে কৌশলে ঢোকাবেই। সব্জির দোকানেও তাই। যে কোনো দোকানে গেলেই টাকাটা নেবে এক-নম্বর মালের, অথচ দেবে দুই-নম্বর মাল। আমি মাস্টারসাহেব ওদের বলির পাঁঠা। প্রতিটা পদে পদে ঠকছি। মানুষ আমাকে কৌশলে প্রতিনিয়ত প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতারিত করছে। ঠকাকে স্বভাবিক অবস্থা ভেবে গা-সওয়া হয়ে গেছে। সামাজিক ও নেতৃত্বের সততায় ঘুণ ধরেছে। একের প্রতি অন্যের আস্থায় ধস নেমেছে। ক্রমশই ঘুণে খেয়ে ধসে

যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ অসহায়ভাবে ঠকছে। পত্রিকায় পড়েছি, বিদেশী অতিথিদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দিতে গিয়ে সেখানেও মেডেলে ভেজাল সোনার নির্লজ্জ ব্যবহার। বিকৃত রাজনীতির ছবক নিয়ে আমরা সবাই চালাক চতুর হতে গিয়ে প্রত্যেকেই একসাথে ঠকছি। দেশটা ঠগবাজের দেশে পরিণত হয়েছে।'

তিনি বলে চললেন, 'আমি বিদেশে বসেই নিজ দেশের ঠগবাজের সাথে সে-দেশের সাধারণ মানুষের তুলনা করতাম। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিংয়ের তুলনায় পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ও ঐ দেশের মানুষ সম্বন্ধে ট্রেনিংই বেশি হয়েছে। অথচ আমি জানি 'ইসলাম শিক্ষা' নামে ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে ট্রেনিং নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি পাস করছে। ধর্মবই মুখস্ত করছে, ভালো নম্বর পাচ্ছে। আটটা বছরেও ইসলামের মূল নীতিমালার ব্যবহারিক চর্চা করাচ্ছি না। পরিবর্তে, রাজনৈতিক বক্তৃতা টিভিতে দেখে ও পরিবেশে বাস্তবে দেখে ও ঠেকে প্রতারণা শিখছে, নকলবাজি শিখছে। কিন্তু আটটা বছর 'ইসলাম শিক্ষা' শিখে ইসলামের কী আদর্শ তারা শিখছে, এটা তাদের কর্ম দেখলেই বোঝা যায়। ইসলাম ধর্মটার প্রাকটিক্যাল শিক্ষা শিখছিনে, মুখস্ত করা শিখছি। পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করছি। ক্লাসরুমে বসিয়ে সাঁতার শেখাচ্ছি। নৈতিকতা, মানবিকতা, দেশপ্রেমের চর্চা করাচ্ছি না। দেশপ্রেমের নাম দিয়ে কুটিল অনৈতিক দলবাজি শিখাচ্ছি। তেমনই উচ্চশিক্ষাতেও সিলেবাসে 'প্রফেশনাল এথিক্স', 'বিজনেস এথিক্স' নামে কোর্স চালু করেছি, এথিক্স প্রাকটিস না করিয়ে মুখস্ত করাচ্ছি। 'এ' গ্রেড পেয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই পাস করছে। চাকরিতে ঢুকেই কিংবা বাস্তব জীবনে গিয়েই দুর্নীতি করছে। ব্যাংক-ঋণ জালিয়াতি, ব্যাংক লুট করছে। লুটপাট করে কীভাবে পার পাওয়া যায় সে-বুদ্ধিও আঁটছে। বড়-ছোট কোম্পানি দেউলে হচ্ছে। আবার 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পনসিবিলিটি', কর্পোরেট গভর্নেন্সের 'কোড অব কন্ডাক্ট' মুখে মুখে তালিম দিচ্ছি। নিয়ম মানা হয়েছে বলে কাগুজে রিপোর্ট দাখিল করতে হচ্ছে। স্বভাব পরিবর্তনের ট্রেনিং দিচ্ছিনে। এ কোর্সগুলোই তো ধর্মের একটা অংশ। ধর্মের নাম দিয়ে এগুলো চালু করলে কেউ মৌলবাদী অভিধায় আখ্যায়িত করতে পারে বিধায় বিভিন্ন নতুন নতুন টার্মিনোলজি ব্যবহার করে ধর্মের কার্যাবলিকে সামনে আনছি। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম (ধৃ+মন) যদি মন ধারণ করে না রাখে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এ কোর্সগুলোর প্রয়োগ বাস্তবে যে কখনই হবে না এবং তা ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হবে, সে-কথা একটুও ভাবিনে।'

তিনি আরো বললেন, 'শিক্ষায় মানুষের আত্মা ও চিন্তার পরিশুদ্ধতা কোথায়? সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ কোথায়? অন্যায়ের প্রতিবাদ কোথায়? নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে হতে অবস্থা তলানিতে ঠেকেছে। নৈতিক মূল্যবোধহীন লেখা এবং পড়া শিখে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে প্রতারক

ও বড় বড় চোর হচ্ছে। এ লেখাপড়া শিখে কী লাভ? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি মানুষ ও সুনাগরিক না তৈরি করে কুখ্যাত বুদ্ধিমান চোর এবং দলবাজ-সন্ত্রাসী তৈরি করে, তাহলে সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরকার কী? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেলেমেয়েদের মানুষ হবার পথ দেখাবে, দেশাত্ববোধ ও মানবতাবোধসম্পন্ন কর্মমুখী মানুষ তৈরি করবে। আমরা কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে নতুন পজিটিভ মূল্যবোধ তৈরি করতে পারছি? এটাই জিজ্ঞাসা। আমার মনে হচ্ছে, আমি অন্ধের দেশে চশমা বিক্রির কথা বলছি। তুমি কি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো?'

'তুমি কি মনে করো তুমি এটা বন্ধ করতে পারবে?' স্বপ্না জোর দিয়ে প্রশ্ন করলো।

'বন্ধ করতে না পারলেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে, তা নয়। স্রোতের প্রতিকূলে অন্তত দাঁড়াতে হবে। আসলে মানুষের জন্যই সমাজ। যারা শিক্ষা দিচ্ছেন, তারাও এ সমাজেরই লোক। সিস্টেম যারা তৈরি করছে তারাও এ সমাজের লোক। এই মানুষই চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গলগ্রহে যাবার চেষ্টা করছে। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু ভালো হবার, ভালো মানুষ গড়ার সেই চেষ্টা কোথায়? পরিবেশ কোথায়? ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন যশোর শহরে এক হোমিও ডাক্তারের কাছে ওষুধের জন্য গিয়েছিলাম। ডাক্তারের অপেক্ষায় দরজার পাশে এক চেয়ারে বসেছিলাম। চোখ গেলো দেয়ালে আটকানো একটা লেখার দিকে 'কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়, দরকার রোগীর ধৈর্য এবং চিকিৎসকের প্রজ্ঞা।' তাঁর সেই লেখাতে আমার বিশ্বাস জেগেছে। এদেশকে এখনো ভালো করা সম্ভব। তবে রোগী চিকিৎসার আগে চিকিৎসকদের চিকিৎসা করাতে হবে, পরিবর্তন আনতে হবে। সবকিছুই সম্ভব বলে আমি মনে করি। আত্মা ও চিন্তার পরিশুদ্ধতা আনতে দরকার মনোমতো সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'মহান রাজনীতিবিদরা' সামাজিক শিক্ষাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেও কলুষিত করে ছেড়েছে। সেখানেও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে, শিক্ষকদের নিয়ে, শিক্ষাঙ্গনকে নিয়ে, শিক্ষার উপকরণ নিয়ে নোংরা রাজনীতি চলছে। চলছে স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি। তাহলে সুশিক্ষাটা আসবে কোত্থেকে? আজও পত্রিকার পাতায় দেখলাম 'বই ছাপানো ও বই বিতরণ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি' শিরোনাম। ভর্তি ও শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির খবর তো প্রতিদিন কোনো-না-কোনো পত্রিকাতে থাকেই। দুর্নীতির খবর এখন কোথায় নেই, সেটাই হারিকেন ধরিয়ে খুঁজে বের করা দরকার। 'সর্ব গায়ে ব্যথা, ওষুধ দেবো কোথা' অবস্থা বিরাজ করছে। এরও অবশ্য চিকিৎসা আছে। অসুবিধা হচ্ছে, রোগীরা চিকিৎসকের চিকিৎসা নিজেদের স্বার্থে নিতে চায় না। রোগীরা নিজেদের ব্যবস্থাপত্র নিজেরা তৈরি করে। 'চাটার দল' রোগীদের পক্ষে স্লোগান হাঁকে। রোগীদের দাপটে চিকিৎসকরা নিশ্চুপ— কোটরের প্যাঁচা, মরমর অবস্থা, পরিস্থিতিও ঘোলাটে।'

‘এসব কথা বাইরের কেউ শুনলে তোমার কপালে ভোগান্তি আছে। আমাদের সংসারের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন শেষ হবে। স্কুলজীবনে তোমার এ বক্তৃতা শুনে তোমাকে ভালোবাসিনি। তোমার চেহারাটা খুব মায়াবী ছিল এবং তুমি খুব ভদ্র ছিলে।’

‘সে মুর্তজা অনেক বদলে গেছে। এখন গলায় ফুলের মালা ঝোলালেও যে কথা বেরোবে, গলায় ফাঁসির দড়ি ঝোলালেও সেই একই কথা বেরোবে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। গানের সেই কথাকেই সত্য মেনে নাও, ‘কী করে পাবে বলো পুরোনো আমায়!’ আমি এখন কলেজশিক্ষক মুর্তজা, এই আমার পরিচয়। আমি এ দেশের একজন শাশ্বত মাস্টারসাহেব।’

‘তুমি হয়তো আমাদের বাড়ির ঐ লোকটার উপর খুব রেগে আছো। আসলে লোক হিসেবে কিন্তু সে খারাপ না। শুধু আমার সাথেই তার বনিবনা নেই। মানুষের অনেক উপকার করে। একটা রাজনীতির আনুগত্য দেখায়। আর ব্যবসা-বাণিজ্য যা করে, ঐ যে এখানকার বড় নেতার ছোট ভাইয়ের সাথে বসে বসে যুক্তি-পরামর্শ করে, ব্যবসার ছক আঁকে, লেনদেন করে, কাজ পায়। এর বাইরে নয়। বিভিন্ন অফিসের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সাথেও তার লেনদেনে ভালো সখ্য। বড় নেতাও মাঝেমধ্যে তাকে ডাকে, লেনদেন করে, কাজ দেয়। সে তেমন খারাপ কাজ করে না।’

‘এদেশে হাজি কেরামতের অভাব নেই, ওরা লক্ষ লক্ষ। আমি সব কেরামতকেই যারপরনাই ঘৃণা করি। ওর প্রতি আমার কোনো ব্যক্তিগত রাগ নেই, নেই কোনো হিংসা। আচ্ছা, এই যে কিছুদিন আগে জেলা, না উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয়ে গেল— হাজি কেরামত সরকারের ভূমিকা সেখানে কী ছিল? সত্য করে আমাকে বলো তো?’

‘ও নিজে কিছুই করেনি, ওরা কয়েকজন মিলে কাজটা পাতিনেতা দিয়ে করিয়েছিল। ভোটের আগের রাতে আমাকে তো ঘুমাতেই দেয়নি। পাঠানো লোকজন রাত দুটোর সময় এসে বলে গেল যে, সিল মারা সব ঠিকঠাক মতো হয়েছে। কোনো অসুবিধে নেই। তখন সে ঘুমাতে গেল। ঐ লোকটা তো কোথাও যায়নি। বাসায় বসেই সব যোগাযোগ করছিলো। অবশ্য রাত দুটোর সময় যখন ওরা বলে গেল যে, সব ঠিকঠাক মতো হয়েছে, তখন ঐ লোকটা আমাকে বললো যে, আসলে কাজটা অন্যায় হলো।’

‘কিন্তু তার সাথে তো সে যুক্ত ছিল। টাকার জোগানও হয়তো সে-ই দিয়েছিল। অন্যায় করে পরে কাজটা অন্যায় বলে স্বীকার করা, আর না-করার মধ্যে পার্থক্য কী?’

‘আসলে তার বুদ্ধিমতো সে চলে, উপায় করে। আমি কিছু বললেই কি সে শুনবে?’

‘আমি তো তাকে চিনিনে। তাকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করছিনে। আমাদের সমাজে এমনই লক্ষ লক্ষ কেরামত সরকারের জন্ম হয়েছে, যারা দেশটাকে কুরে কুরে

খাচ্ছে। একটা পক্ষ এদেরকে পুষছে, নিজ স্বার্থে সহযোগিতা করছে। রাতকে দিন বানাচ্ছে, দিনকে রাত। এখানেই আমার আপত্তি। তুমি আবার তাকে ভাত রান্না করে খাওয়াও, তার সাথে সংসার করো। কখনো ভালো বলো, কখনো খারাপ বলো। মাঝেমধ্যে তোমার কথার উপর ভরসা হারিয়ে ফেলি।'

'না, আমাকে বিশ্বাস করো। আসলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার কাছে চলে যাব। শুধু গুছিয়ে নিতে পারছিনে বলে যাওয়া হচ্ছে না। এতটা বছর পর আবার যেহেতু তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে আমি কোনোভাবেই হাতছাড়া করবো না। তুমিই আমার জীবনের সব। তোমাকে আঁকড়ে ধরে আমি বাঁচতে চাই। আমি পরিকল্পনা করছি। তুমি আমাকে আর দুটো মাস সময় দাও।' স্বপ্না অনুনয়-বিনয় করে বললো। আরো বললো, 'প্রতি রাতেই তোমাকে নিয়ে নানা রকম স্বপ্ন দেখি। ভাবি, দিনে না হলেও রাতে স্বপ্নে তো তোমাকে পাচ্ছি। সব সময় তোমাকে নিয়ে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই। কখনো দেখি, তোমার সাথে সংসার করছি, কখনো সেই ছোটোবেলায় ফিরে যাই, তোমার সাথে বিয়ে হয়। কখনো হাত ধরাধরি করে সেই স্কুলের পথে চলি। বুঝতে পারিনে এর শেষ কোথায়!'

'কিন্তু স্বপ্না, তুমি কি আমার দিকটা একবারও ভেবে দেখেছো? আমাকে আশা দিচ্ছো। আবার দেখা হবার পর থেকে তিনটা বছর পার হয়ে গেল। আমি যে আর থাকতে পারছিনে। আমার ধৈর্যের বাঁধ যে ক্রমশই ভেঙে যাচ্ছে। বয়স শেষ দিকে চলে আসছে, শরীরটাও ক্রমশই ভেঙ্গে যাচ্ছে, তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ক্রমশই বাড়ছে। মোটের উপর আমার জীবন নদী যে শুকিয়ে চর পড়ে যাচ্ছে। জীবনের স্রোত ক্রমশই স্থিমিত হয়ে আসছে। তুমি কি আমার এসব বিষয় নিয়ে ভাবো?'

'আমি আর পারছিনে, আমার দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসছে। ভাবতে গেলেই আমার মাথাটা ঘুরতে থাকে।' স্বপ্না কাঁদতে থাকে।

'কেঁদে আর কী হবে? একটা সিদ্ধান্তে আসো। আমি তোমাকে কোনো চাপ দেবো না। তুমি যদি ভাবো যে, আমার কাছে আসা সম্ভব নয়, আমাকে খোলাখুলি বলে দিও। আমার কাছে কিছু লুকিও না। আমি মনে কিছু করবো না। সে-ক্ষেত্রে হয়তো যতদিন দুজনে বেঁচে থাকি সম্পর্কটা থাকবে। দুজনে দুজনার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে বেঁচে থাকবো। যোগাযোগটা থাকবে। বিপদে পাশে দাঁড়াবো। কিন্তু অপেক্ষার প্রহর গোনা খুবই কষ্টদায়ক।'

'আমার খারাপ লাগে, আমি তোমার সংসারটা ভেঙে দিয়েছি। তুমি একাকী থাকো। খেয়ে না-খেয়ে বেঁচে আছো।'

‘না, তুমি আমার সংসার ভাঙোনি। এটা তোমার ভুল ধারণা। তোমার সাথে দেখা হবার অনেক বছর আগ থেকেই আমার সংসারে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল। আট বছর হলো আমরা পৃথক হয়ে গেছি। এতে তোমার কোনো দোষ নেই। সত্যি বলতে কী, তোমার জন্য আমার দুশ্চিন্তা বেড়েছে, শরীর ভেঙেছে। ক্রমশই নির্জীব হয়ে যাচ্ছি। তুমি কষ্টে আছো ভাবলেই আমার আর রাতে ঘুম হয় না। সারাদিন অন্যমনস্ক থাকি। তোমার শরীর খারাপ, প্রেসার বেড়েছে শুনলে আমার মনোকষ্ট বেড়ে যায়। নিজেকে ব্যর্থ ও অযোগ্য মনে করি। তোমার কষ্টের সময় তোমার পাশে দাঁড়াতে পারিনে। শুধু এটুকুর জন্য তোমাকে দায়ী করা যায়। আমাকে নিয়ে তুমি এতো ভেবো না। একটা সিদ্ধান্ত নাও। আমাকে খোলাখুলি বলো। আমার কোনো কিছুতে আপত্তি নেই। আমার সাথে যেন কোনো লুকোচুরি করো না। আমার এই একাকীত্ব, ব্যর্থ জীবন নিয়ে তুমি ভেবো না। আচ্ছা, কতদিন যে তোমার মুখখানা দেখিনি, বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। তুমি কি এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকায় আসতে পারো? অন্তত মুখটা দেখাদেখি হবে। পারলে কোথাও দাঁড়িয়ে কিংবা বসে কথা বলা যাবে। তুমি তো চেষ্টা করলেই ছেলের বাসায় আসার নামে ঢাকায় আসতে পারো। চিকিৎসার নাম করেও আসতে পারো।’

৮.

আরো পাঁচ মাস গত হয়ে গেল— স্বপ্নার ঢাকায় আসা হলো না। হঠাৎ একদিন বললো, ‘আগামীকাল ঢাকায় যাচ্ছি।’ মুর্তজার স্বপ্নাকে দেখার তর সইছে না। ঢাকায় আসার পর থেকে স্বপ্নার ছেলে-বউ ও মেয়ের কারণে মুর্তজাকে ফোনও করতে পারছে না। এ এক অসহনীয় অবস্থা। তিন দিন পর একসময় ফোনে বললো, ‘আগামীকাল এগারোটার দিকে মালিবাগ মোড়ের পুবপাশের কোনায় রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলবো আর চা খাবো। তুমি যথাসময়ে এসো।’

মুর্তজা এগারোটার আগে মালিবাগ পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। পথে যানজট হতে পারে। মাঝপথে স্বপ্নার ফোন পেল। ‘আজ আর দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না। রাত থেকে মেয়েটার জ্বর। মেয়েকে বাসায় রেখে বেরোনো সম্ভব হবে না। আবার কখন দেখা হবে আজ বিকালে জানাবো। হয়তো আগামীকাল দেখা হবে।’

বিকাল গড়িয়ে রাত এলো, কোনো ফোন নেই। মুর্তজা রাতে একবার ফোনও করলেন। স্বপ্না ফোন ধরলো না। পরের দিন বিকালে এক মিনিট ফোন করে বললো, ‘আজ আর হবে না, বাড়ি থেকে ঐ লোকটা আজ ঢাকায় আসছে, কদিন থাকবে জানিনে। দেখা করার কথা পরে হবে।’

মুর্তজার মনটা খারাপ হয়ে গেল। 'হাজি কেরামত সরকার যে ঢাকায় আসবে গতকালও স্বপ্না আমাকে জানায়নি কেন? তার আসা নিয়ে হয়তো সন্দিহান ছিল।' মুর্তজার খারাপ লাগলো এই ভেবে যে, তাঁকে তো খুলে বললেও পারতো।

মুর্তজা মাঝখানের দুদিন ফোন আর করেননি। তৃতীয় দিনের দিন বিকালে ফোন এলো, 'তুমি কি এখনই আসতে পারো? মেয়েটা থাকতে চাচ্ছে না, আমি আগামীকাল যশোর ফিরে যাচ্ছি।'

মুর্তজা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি এখন শিক্ষকদের মিটিংয়ে, ষোলো কিলোমিটার দূরে আছি। এই দীর্ঘ যানজটে পৌঁছাতেই তো দুই-আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে। ততক্ষণে রাত হয়ে যাবে। কীভাবে এখনই তোমার ওখানে যাব? পারলে আরেকটা দিন থেকে যাও। তুমি না আমার সাথে দেখা করার নাম করেই ঢাকা এসেছিলে?'

'না, সম্ভব হবে না। টিকিট কেটে ফেলেছি। পরে আসলে দেখা হবে।'

'টিকিট কাটার আগে অন্তত আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারতে?'

'না, যেতেই হবে।' স্বপ্নার একই উত্তর।

মুর্তজা কোনো কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দিলেন। স্বপ্নার কাছে মুর্তজার মুখখানা দেখা ও দেখা করার গুরুত্ব কম– তা তিনি বুঝে ফেললেন। মুর্তজা স্বপ্নার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।

পরের দিন স্বপ্না যশোর ফিরে সন্ধ্যার পর মুর্তজাকে ফোন দিল। ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছেছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথাই বললো, স্যরি বললো। কিন্তু মুর্তজার মনটা আর ভালো হলো না। স্বপ্নার কাছে মুর্তজা গুরুত্বহীন ও অবহেলার পাত্র বলে নিজেকে ভাবলেন। মুর্তজার মাথায় সন্দেহের পোকা ঢুকলো। ভাবলেন, তাহলে স্বপ্না তো কখনোই আমার জন্য ঢাকায় আসে না, তার সংসারের প্রয়োজনে হাজি কেরামতের কথামতো আসে। এক কথা দিয়ে অন্য কথা ঢাকতে গিয়ে মুর্তজা আরো বুঝে ফেললেন যে, স্বপ্নার পক্ষে তার সাংসারিক জীবনের ক্ষতি হয় এবং হাজি কেরামতের মতামতের একবিন্দুও বাইরে যায় এমন কিছু করা সম্ভব নয়।

স্বপ্নার সাথে কেরামতের কথা হয় না, ফোনেও কথা হয় না, মেয়ের মাধ্যমে কথা হয়– এসব কথার ঘটনাপরম্পরা মিলাতে গিয়ে মুর্তজার মনে ক্রমশই বিয়ষটা সন্দেহজনক মনে হতে লাগলো। মুর্তজা এর আগেও দেখেছেন, হাজি কেরামতের সাথে বিভিন্ন কথাবার্তা মেয়ের মাধ্যমে হয় বলে স্বপ্না যা জানায়, কয়েক দিন পর একই কথা ভিন্নভাবে এলোমেলো ভাষায় বলে। কথার বৈপরীত্য বোঝা যায়, মুর্তজার চোখে অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়ে যায়। মুর্তজা পাল্টা প্রশ্ন করলে স্বপ্না বিভিন্ন কথা দিয়ে কথা

ঢাকে— একটা মিথ্যা ঢাকতে দশটা মিথ্যা বলতে হয়। শেষে উটপাখির মতো বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিজেকে লুকাতে পেরেছে ভাবে। মুর্তজা মুখ খুলে কিছুই বলেন না, কিন্তু বোঝেন। তাঁর সন্দেহ হলো, দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। এমনটি তো হবার কথা নয়। হাজি কেরামতের সাথে স্বপ্নার ভালো সম্পর্ক থাক এটা মুর্তজাও চায়। কিন্তু সে-সম্পর্ক মুর্তজার কাছে এত লুকানোর কারণ কী, তা তিনি বুঝতে পারেন না।

মুর্তজা সেতুকে ফোন দিলেন। কেমন আছে জানতে চাইলেন। কথায় কথায় হাজি কেরামত সরকার ও তার আপার কথা তুললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কেমন আছে? দুজনের মধ্যে বনিবনা কেমন?'

'আমি তো মাঝেমধ্যে যাই, তাদের সাথে একসাথে বসে গল্প করি, রসিকতা করি, একসাথে বসে সবাই খাই, চলে আসি, কোথাও তো অমিল দেখিনে। আপা দুলাভাইয়ের কথার একটুও বাইরে যায় না। ভালোই আছে। তাদের দাম্পত্যজীবনের একচুল ক্ষতি হোক এমন কোনো কাজ আপা করে না। আপা দুলাভাইয়ের টাকার গর্বে গর্বিত। সব জায়গায় তার সুনাম করে। শুধু সম্পত্তিজনিত কোনো কোনো বিষয়ে একটু মনোমালিন্য কখনো কখনো হয়।'

আরও বিভিন্ন কথা বলে ওদের সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর নিয়ে মুর্তজা সেতুর সাথে ঐ-দিনের মতো ফোন রাখলেন।

মুর্তজা স্বপ্না-সমীকরণ কোনোমতেই মিলাতে পারছেন না। তিনি প্রথম থেকেই কোনোদিনই স্বপ্নাকে তাঁর কাছে আসার জন্য কোনো চাপ দেননি। বরং স্বপ্নাই প্রথম প্রথম মুর্তজাকে তার আসার ইচ্ছের কথা বলেছে। মুর্তজা তাকে নিতে চায় না বলে স্বপ্না অনেক অভিযোগ-অভিমানও করেছে। এক সময়ে সে কীভাবে আসতে চায় পরিকল্পনা জানতে চাওয়াতে মাসের পর মাস সময় নিচ্ছে। এভাবে তিনটা বছরও পার করে ফেলেছে। আবার আশাও দিচ্ছে। এখনও সঠিক মতামত দিচ্ছে না। অনিশ্চিত অবস্থার উপর বিষয়টা রেখে দিচ্ছে। হাজি কেরামতের সাথে তার দাম্পত্য সম্পর্ক লুকাচ্ছে। মুর্তজার সাথে ফোনালাপের সময় তাঁকে ছাড়া সে বাঁচবে না বলে জানাচ্ছে। প্রতি রাতেই তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে এবং তাঁর প্রতি বিরহে সে সব সময় কাতর, তা জানাচ্ছে। মুর্তজা ছাড়া তার জীবনে আপন বলে আর কেউ নেই বলেও কথায় কথায় কাঁদছে। এর কারণ মুর্তজা উদ্‌ঘাটন করতে পারছেন না। তিনি এর শেষ কোথায় তার কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না।

মুর্তজা বিষয়টাকে এভাবে ভাবছেন যে, স্বপ্না হয়তো প্রথম দিকে তাঁকে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিল, তিনি তাকে নিতে চান কিনা। জীবনে সহজে যা পাওয়া যায় তার মূল্য অনেকেই কম দেয়। মুর্তজা রাজি হওয়াতে স্বপ্নার আগ্রহে হয়তো ভাটা

পড়েছে, মুর্তজার গুরুত্বও কমে গেছে। তারপর হয়তো স্বপ্না সিদ্ধান্ত মনে মনে নিয়ে রেখেছে, যা মুর্তজাকে জানাচ্ছে না। অথবা তাঁকে দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে হাতে রেখেছে– ওয়েটিং লিস্টে রাখার মতো, যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে, প্রয়োজন না হলে নাই। এমনও হতে পারে, স্বপ্নার হাতে অবসর সময় আছে, হাজি কেরামত ব্যবসার কারণে সময় দিতে পারে না, তাই অবসর সময়টা মুর্তজার সাথে ফোনে কথা বলে ভালোভাবে কাটানো যায়, আবার স্মৃতিমন্থনও করা যায়। এর মধ্যেও একটা তৃপ্তি আছে। ওয়েটিং লিস্টে রাখার সুবিধা হলো, মূল যাকে নিয়ে সংসার করবে সে তো আছেই। খোদা না খাস্তা যদি বিকল্পের প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয় বিকল্প তখন হাতের পাঁচ। মুর্তজা ভাবেন, বুদ্ধিটা ভালো কিন্তু এভাবে চলা বেশিদিন সম্ভব নয়। স্বপ্নার মনোভাব কাজে-কর্মে ক্রমশই পরিষ্কার হবে। কথাবার্তায় কয়েকবার উলট-পালট হলে যে কারও সাথেই মুর্তজার বনিবনা হয় না, তিনি বেঁকে বসেন।

কথা ও কাজে অসংগতি দেখে মুর্তজার মনে সংশয় ক্রমশই বাড়ছে। তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন। আবার স্বপ্নাকেও খুলে বলতে পারছেন না।

মুর্তজা নিজেকে নিয়ে তো কখনোই কিছু ভাবেন না। প্রথম জীবনে যখন স্বপ্নাকে ছাড়তে হয়েছে এবং পরবর্তী জীবনে যখন ছেলেমেয়ে ও সালেহাকে ছাড়তে হয়েছে, সে-ক্ষেত্রে বাকি জীবন নিয়ে তাঁর কোনো ভাবনা নেই। প্রয়োজন হলে তাঁর লাশ 'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' দাফনের ব্যবস্থা করবে, এটা উনি মনে মনে ধরেই নিয়েছেন। তবে স্বপ্নার এ কথিত ভালোবাসা অথবা ছলনা, সবকিছুর জন্যই মুর্তজা প্রস্তুত। সবকিছুই তিনি হাসিমুখে মেনে নেবেন। কিন্তু স্বপ্না কৃত্রিমতার আশ্রয় নিলেই মুর্তজা দূরে চলে যাবেন। তাঁর পরবর্তী সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নেবেন। মুর্তজার প্রশ্ন, স্বপ্না কি এসব ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারতো না? সত্যটা প্রকাশ করলে অসুবিধা কী ছিল? বিশ্বাসে ঘুণ একবার ধরলে ভালোবাসাকে জরাজীর্ণ করে ফেলে। তখন ঠুনকো আঘাতেই ভেঙে যায়।

স্বপ্না মুর্তজাকে ভালোবাসে এটা মুর্তজা বোঝেন। কিন্তু সে ভালোবাসার মাত্রা কতটুকু? তা কি সবকিছুর উর্ধ্বে? না-কি স্বপ্নার ব্যক্তিস্বার্থের উপর নির্ভরশীল? সে কি মুর্তজাকে বিকল্প পথ হিসেবে হাতে রাখতে চায়? বদলি খেলোয়াড়ের ভূমিকায় কাজে লাগাতে চায়? মুর্তজার ধারণা, স্বপ্না প্রথমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, হয়তো কোনো বিষয়ে ভাবনার পর মনে মনে সে সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এসেছে, যা সে প্রকাশ করছে না। — মুর্তজার মনে ঘুণ ধরেছে।

পরের দিন সন্ধ্যার পর মুর্তজা স্বপ্নাকে ফোন করলো। স্বপ্নার হাস্যোজ্জ্বল কথাবার্তা। স্বপ্না মুর্তজার ব্যবসা প্রসঙ্গ উঠালো।

‘তুমিই না একদিন কথায় কথায় বলেছিলে যে, তুমি চাকরির মাঝখানে একবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাকায় এসে ব্যবসা করবা বলে ভেবেছিলে। ব্যবসা করলে না কেন?’

‘হ্যাঁ, তোমাকে বলেছিলাম। তুমি তো জানো আমি চাকরির তুলনায় ব্যবসা করতে পছন্দ করি। আজ থেকে পনেরো-ষোলো বছর আগে কলেজ থেকে চাকরি ছেড়ে বিভিন্ন পাওনা বুঝে নিয়েছিলাম। সে টাকা দিয়ে ব্যবসা করবো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এলাকায় গিয়ে বিষয়টা নিয়ে কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করলাম। দোকানদারি ব্যবসা কিংবা আড়তদারি ব্যবসা করা যেতো, আমি তা চাইনি। চেয়েছিলাম ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধরনের একটা কিছু করতে। আমার একটা পরিকল্পনাও ছিল। আমার দূরসম্পর্কীয় এক চাচা এসে প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি তো কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক দলে ভেড়োনি? রাজনৈতিক মস্তানিতে ভিড়লে আলাদা কথা। তুমি কি এলাকার রাজনৈতিক মস্তান টাকা দিয়ে পুষতে পারবে? না পারলে চাঁদার অত্যাচারে অল্পদিনের মধ্যেই তোমার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয়ে যাবে। চাঁদা না দিতে পারলে শেষে জীবন হারাবে। রাজনৈতিক দল, চাঁদাবাজ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চাঁদার ব্যাপারে তলে তলে একজোট। নইলে এদেশে চাঁদাবাজ টিকে থাকতে পারতো না। তুমি বাবা জীবনটা হারিও না। যে মাস্টারি করে খাচ্ছিলে সেখানেই ফিরে যাও’।’

‘আমি জানি, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবসা শুরু করতে চাইলে তা পারতাম। কালো টাকা কীভাবে উপার্জন করতে হয় তা আমিও জানি। কিন্তু কালো টাকা আমার পেটে সয় না। অবৈধ টাকা আমি ঘৃণাও করি। তাই ব্যবসার ইচ্ছে ছেড়ে আবার ঢাকায় ফিরে এসেছিলাম। এরপর কী হয়েছিল জানো?’

‘না, তুমি বলো, আমি অন্তত শুনে রাখি।’

‘ঢাকায় ফিরে আসার পরপরই এলাকার দুজন বন্ধু এলো আমার কাছে। টাকার খুব প্রয়োজন। আমার এ টাকাগুলো ছাড়া তাদের কোনোক্রমেই চলছে না। অনন্যোপায় হয়ে পুঁজির বিশ লাখের মধ্যে দুজনকে আট লাখ টাকা হাওলাত দিতে বাধ্য হলাম। পরবর্তী ঘটনা আরো মধুর। দুজন বন্ধুই টাকা আর কোনোদিনই ফেরত দিল না, সম্পর্কটাও ওখানেই শেষ। পরবর্তী পর্ব আরো আকর্ষণীয়। ‘মধুর চেয়ে আছে মধুর সে আমার এই দেশের মাটি, আমার দেশের’ ‘মানুষগুলো’ ‘খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি’। আমরা অনেক গুণে গুণান্বিত। ব্যাংকে টাকা রাখবো, লাভ কম। লাভের উপর আবার আয়কর, উৎসস্থলেই কর্তনীয়। ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’ অবস্থা। ব্যাংক আমানতের লাভের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি। ফলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশই কমতে থাকে। কেউ কেউ শেয়ার বাজারে টাকা খাটাতে বললো। বাজার আনস্ট্রাকচারড। ফটকা কারবার। পুরো বাজারটাই কতিপয় ডাকাতের হাতে বন্দি। তারা যা-ই করুক কোনো বিচারও আবার হয় না।’

‘টাকার ক্রয়ক্ষমতা ও আমার মতো নির্দিষ্ট বেতনে বেঁচে থাকার কথা তোমাকে একটু বলি। একসময় এক হাজার টাকার নোটগুলোকে খুব সমীহ করে চলতাম। আমার হাতে কম আসতো। দিনে দিনে এখন দেখছি, এক হাজার টাকার নোট ভাংতি করে মানুষ পান কিনে খাচ্ছে। ঢাকা শহরে কাঁঠালের পাতার যে মূল্য আছে, এক হাজার টাকার নোটের সে মূল্যটুকুও নেই। পকেট থেকে বের করলেই টুকিটাকি জিনিস কিনতে কোথায় যেন উড়ে যায়। এখন আবার পাঁচ হাজার, দশ হাজার টাকার নোট বাজারে ছাড়ার সময় এসেছে। দেখে মরতে পারলে মরণ সার্থক হয়। বৈধ উপায়ে টিকে থাকা যে কত কষ্টকর ও সাধনার ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝবে না। জিনিসের মূল্য ক্রমশই বাড়ে, আমার শ্রম ও মেধার মূল্য সে হারে বাড়ে না। খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হয়। আমার ছেলেমেয়ে দুটোই মেধাবী এবং ফেসবুক ও মোবাইল ভাইরাসে আক্রান্ত না হয়ে সুস্থ চিন্তা করে, জীবনে উপরে ওঠার স্বপ্ন দেখে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বলে কম বেতনে তাদের পড়াতে পারছি। নইলে তাদের উচ্চশিক্ষা বন্ধ হয়ে যেত।’

‘আরো শোনো, অন্য কথায় আসি। আরেকটা কলেজে আবার যোগদান করলাম। বেতনের টাকায় পেট চলে না। প্রাইভেট টিউশনি, নোট বিক্রি করলে অনেক রোজগার। আমার তা ধাতে সয় না। ভাবলাম, হাতের পুঁজিটা কোথাও খাটিয়ে কিছু লাভ পেলে টেনেটুনে টিকে থাকা যাবে। দীর্ঘদিনের পরিচিত এক ব্যবসায়ীর পুঁজি অল্প। লোক ভালো। পুঁজির অভাবে ব্যবসা ভালো চলছে না। তাকে বিশ্বাস করে পুঁজিটা দিলাম। যে লাভ হয় তার একটা অংশ আমাকে দেবে, সেও নেবে। সেও বাঁচুক, আমিও বাঁচি— এমন একটা চিন্তাধারা। সম্পর্কটা খুব ভালো। বছর গেল, কোনো লাভ নেই, দুই বছর, তিন বছর, চার বছর, তার ব্যবসাতে কোনো লাভ নেই। শেষে আসল ফিরে পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে গেল। সাত বছর পর সম্পর্কটা ভালো রেখে কিস্তিতে এক বছর ধরে আসল ফিরে পেলাম। ততোদিনে আমার বারো লাখ টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমতে কমতে চার লাখ টাকায় এসে ঠেকেছে। রাতের অন্ধকারে পচা-পানির ডোবায় নাক ধরে সাতটা ডুব মেরে কান ধরে প্রতিজ্ঞা করলাম, ‘কাউকে টাকা হাওলাত দেব না। কারো সাথে ব্যবসায়ে জড়াবো না।’ কিন্তু ‘ইল্লত না যায় ধুলে, খাসলত না যায় ম’লে’। আমার অবস্থাও তাই। আমার খাসলতের কোনো পরিবর্তন হয়নি, একটু সতর্ক হয়েছি মাত্র। ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।’ আমার হাতে টাকা থাকলেও পারতপক্ষে কাউকে দিইনে। আমি জানি আমার মতো লক্ষ লক্ষ লোকও তাই করে। যদিও দেশে বেকারের সংখ্যা অগণিত। ইচ্ছে করলেই পুঁজি পাওয়া যায় না। উভয় পক্ষই যদি সততার পরিচয় দিতে পারতো, আমি নিশ্চিত, উভয়েই লাভবান হতো। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়তো। বেকারত্ব কমতো।

অতীতে এ দেশের মানুষ সহজ-সরল ছিল। কুটিল রাজনীতির ছোঁয়া মানুষকে ক্রমশই বিকৃত চিন্তার খোরাক ও ইন্ধন জোগাচ্ছে। দেশে যত চতুর ও প্রবঞ্চকের সংখ্যা বাড়ছে, দেশ তত নীচের দিকে যাচ্ছে, সামাজিক শান্তি নষ্ট হচ্ছে। নীতিহীন, মনুষ্যত্বহীন কুটিল বুদ্ধির মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, বরং পশুর তুলনায় খারাপ। এ সংখ্যা সমাজে বেড়েই চলেছে। মানুষের জন্যই সমাজ। সমাজে মানুষ বাস করে। একজন মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে সমাজে অন্য মানুষের উপর নির্ভরশীল। সেই মানুষগুলোই যদি ক্রমশ জটিল ও কুটিল পথে হাঁটতে থাকে, কুটিল চিন্তা করতে থাকে, কুটিল কৌশল খাটাতে থাকে, তাহলে সে-সমাজে শান্তি আসে কী করে? সে-সমাজের উন্নতি হয় কী করে? সমাজ জটিল ও কুটিল কাজ-কারবারে ভরে গেছে। তাই আমাদের এই অধঃপতন।'

'আমি মাস্টার মানুষ। যেদিকে তাকাই এগুলোই দেখি। দেখেছি, যে দেশের জনগোষ্ঠী সহজ-সরল অথচ পরিশ্রমী— নীতিবান, স্বজনপ্রীতিহীন, প্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব পেলে সে দেশ অতি অল্প সময়ে উন্নতির একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছে যায়।'

'এতক্ষণে তুমি হয়তো ধৈর্যহারা হয়ে গেছ। এসব মাস্টারি বয়ান তোমার ভালো লাগার কথা না। আমার এসব গল্প করা নিছক বাতুলতা। তুমি আছো তোমার সংসারের সুখ-শান্তি, হাজি মানুষের সেবাযত্ন, আর হজের গর্ব নিয়ে। তোমার কাছে হাজি মানেই ফেরেস্তা। এসব লেফাফাদুরস্ত হজের মূল্য তোমাদের কাছে অনেক বেশি হলেও সমাজের অনেকের কাছেই এর মূল্য নেই। অনেকেই তোমাদের অলক্ষ্যে মুখ টিপে হাসে। তোমরা কি তা বোঝো?' মুর্তজা খোঁচা মেরে কথা বললেন।

'তুমি তো সবকিছুর মধ্যে ঐ লোকটাকে জড়িয়ে নাও। এতে আমার রাগও হয়। আমি তো সব সময় তোমাকে বলি যে, ঐ লোকটার সাথে আমার কথাবার্তা তেমন হয় না। মাঝেমধ্যে দূরে দাঁড়িয়ে সে দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা বললেও আমি কখনো 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে সরে পড়ি। আমি যা বলি মেয়েটার মাধ্যমে বলি। হাট-বাজারের প্রয়োজন হলে ড্রাইভারকে বলি, ড্রাইভার ঐ লোকটাকে বলে।'

'তোমাদের সংসারের মধ্যে ড্রাইভারকে জড়িয়ে ফেলাটাও ঠিক নয়। সে কী ভাববে, বলো?'

মুর্তজার মনের ঘুণ কাটেনি। কিছু ঘটনা মনে উঁকি দিচ্ছে, মাঝেমধ্যেই তো দেখি আমার সাথে ফোনে কথা বলার সময় অন্য কোনো ফোন এলে স্বপ্না বলে, 'একটু ধরো'। অন্য ফোনে হ্যালো বলে তার সাথেই কখনো কথা চালিয়ে যায়, এ সময় আমি ফোন ধরে রাখি। আবার কখনো আমার ফোনের লাইনটা হঠাৎ করেই কেটে দেয়। তাহলে হাজি কেরামতের ফোন এলে কথার ভঙ্গিতেই তাদের সম্পর্ক আমি বুঝে

ফেলবো বলেই কি হঠাৎ ফোনটা কেটে দেয়? পরে অবশ্য স্বপ্না বলে যে, স্যরি, ফোনটা কেটে গিয়েছিল। মুর্তজার মনে সন্দেহ আরো দানা বাঁধে। মুর্তজা ভাবেন, ফোনটা কেটে গিয়েছিল, না ফোনটা কেটে দেওয়া হয়েছিল।

দিন কেটে যাচ্ছে। ফোনালাপও প্রায়ই হচ্ছে। একদিন স্বপ্না বললো যে, ঐ লোকটার মেয়েকে বলতে শুনলাম— টেরাকোটা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে কয়েকজন সদস্য বিশ-পঁচিশ দিনের জন্য বেড়াতে দেশের বাইরে যাচ্ছে, সেও যাবে। পাসপোর্টে ভিসা না-কি লাগাতে দিয়েছে।

'তুমিও সাথে যেতে পার। অন্য দেশ ঘুরে আসলে বেশ ভালো লাগবে।'
'আমাকে সাথে নেওয়ার কথা সে বলছে না কি? আমার সাথে তো কথাই হয় না। সে যাবে তার অন্য ব্যবসায়ী বন্ধুদের সাথে। আমাকে যেতে বললেও তো আমি যাব না। তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও বেড়িয়ে শান্তি পাব না। সেই প্রথম জীবন থেকেই তোমাকে নিয়ে বিভিন্ন দেশ ঘোরার আমার খুব ইচ্ছে। আল্লাহ যদি মনোবাসনা পূর্ণ করে, একদিন হবেই হবে। এতদিন পরে যেহেতু আমাদের দেখা হয়েছে, একসাথে বেড়াতে যাওয়াটাও নিশ্চয়ই হবে। আরেকটা কথা— আমি ভাবছি, ঐ লোকটা বিদেশে গেলে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনোভাবে তোমার সাথে আমি দেখা করবোই। অনেক সময় কাটানো যাবে। আমার কষ্টের কথাগুলো সামনাসামনি বলবো। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটাও পাকাপাকি করা যাবে। তুমি কিন্তু প্রস্তুত থেকো। কতদিন তোমাকে দেখিনি। আমি চেষ্টা করছি, বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছে।'

'সবকিছুই আল্লাহর উপর ছেড়ে দিও না। তোমার ইচ্ছে আগে, তারপর আল্লাহ তা পূরণ করবে। আমার ইচ্ছে দুজনে একসাথে হতে পারলে আগে তোমাকে সাথে করে হজে যাব, তারপর অন্য কোথাও। আমার তো কোনো পিছুটান নেই। তুমি যেখানে খুশি বেড়াতে যেতে পারো। তাছাড়া প্রথম জীবনের তুলনায় শেষ জীবনে পাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। শেষ ভাল যার, সব ভালো তার। আমাদের জীবনও তো শেষ হতে চলেছে। আমার জন্য কবরের জায়গাটা ঠিক করে রেখেছি। পাশে তোমার জায়গাটাও রেখেছি। অনন্তকাল ধরে দুজনে পাশাপাশি থাকা যাবে।'

স্বপ্না কোনো উত্তর দেয় না। শুধু বলে, 'আল্লাহ যে কপালে কী লিখেছে, বলা যায় না।'

দিন দশেক পরে স্বপ্না বললো, 'মেয়ের কাছে বলতে শুনলাম, আগামী বৃহস্পতিবার রাতে ঐ লোকটা অন্যদের সাথে যশোর থেকে ঢাকা যাবে। পরদিন ফ্লাইট।'

'এখনও তো আট দিন বাকি। ঢাকা এয়ারপোর্টে তুলে দিতে তুমি যাবে না কি?'

'না, আমার শরীরটা ভালো না। তাছাড়া সে যাবে অন্য লোকের সাথে। আমাকে যে যেতেই হবে এমন তো কোনো কথা নয়। তার মতো সে যাবে।'

স্বপ্না যাবে না, মুর্তাজাকে এটাই বোঝাতে চাইল।

বৃহস্পতিবার আসতে আর দুদিন বাকি। মুর্তজা স্বপ্নাকে ফোন করলো, 'কেমন আছো? গত দুদিন থেকে কথা নেই। আমার শরীরটাও অবশ্য ভালো নয় বলে ফোন করিনি।'

'আমার শরীরটাও বেশ খারাপ। গত দুদিন থেকে জ্বর, গায়ে ব্যথা, মাথা তুলতে পারছিনে। অত্যন্ত মাথা ব্যথা করছে। কিছুই ভালো লাগছে না। শুধু তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।' স্বপ্না উত্তর দিলো।
'ঢাকায় আসছো কি না?' মুর্তজা জিজ্ঞেস করলো।
'এই শরীর নিয়ে কি ঢাকায় যাওয়া যায়? আমি এখনো জানি আমি যাব না।'

বুধবার মুর্তজাকে ফোন করে স্বপ্না তার অসুস্থতার কথা আবারো জানালো। মুখে রুচি নেই, কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর দুটায় মুর্তজা ফোন করলেন। স্বপ্নার শরীরটা আজ কেমন, জ্বরটা কমলো কিনা খোঁজ নিতে চাইলেন।

স্বপ্নার অসুস্থতায় মুর্তজা খুব চিন্তিত। একটু ভালো সংবাদ পেলেই ভালো লাগবে। স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করতেই স্বপ্না বললো, 'অপেক্ষাকৃত ভালো। তবে ভলোমতো হাঁটতে-চলতে পারছিনে।'

আরো অন্য প্রসঙ্গ আলোচনায় চলে এলো। হঠাৎ অন্য ফোনে স্বপ্নার একটা ফোন এলো। স্বপ্না মুর্তজাকে একটু ধরতে বলে অন্য ফোনে হ্যালো বললো। তারপর বললো, 'না ভাই, আমার পক্ষে তো আজ এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না, আমি আজ রাতে ...।' কথাটা শেষ না হতেই মুর্তজার ফোনের সংযোগ কেটে গেল।

বৃহস্পতিবার শব্দটা মুর্তজার মাথায় আগে থেকেই ছিল। মুর্তজার বুঝতে আর কিছুই বাকি রইল না, স্বপ্না আজ রাতে ঢাকা আসছে। মুর্তজা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলেন। তাঁর মাথাটা ঘুরছে। দারুণভাবে ঘুরছে। ভাবছেন, আজ রাতে স্বপ্না ঢাকা আসছে, তা তো তাঁকে জানাচ্ছে না। আমি আছি যেখানে, সেখানে স্বপ্না গোপনে আসছে, অথচ আমাকে জানাচ্ছে না— এটা কী করে হয়? মুর্তজা সহ্য করতে পারছেন না। স্বপ্নার ঢাকায় আসার কথা শুনলেই মুর্তজার বুকের স্পন্দন কেন জানি বেড়ে যায়।

পাঁচ মিনিট পর স্বপ্না রিং ব্যাক করলো। বললো, 'ফোনটা কেটে গেল। তুমি কি দুপুরে খেয়েছো?'

'না, এখনোও খাইনি। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। মাথাটা ঘুরছে, চেয়ারে বসতে পারছিনে।'

স্বপ্না কথাটা যেন শোনেনি এমন ভাব দেখিয়ে বললো, 'খেয়ে নাও।'
'খিদে নেই। মাথাটা খুব ঘুরছে। বুঝেছি, তুমি এখন খুব ব্যস্ত। ফোনটা কেটে যায়নি, সজাগ হওয়া মাত্র কেটে দিয়েছিলে।' মুর্তজা উত্তর দিলো।

মুর্তজার কথা স্বপ্না মন দিয়ে শুনলো বলে মনে হলো না। স্বপ্নার কথায় খুব চঞ্চলতা। বললো, 'না খেয়ে থাকলে খেয়ে নাও, পরে কথা বলবো।' স্বপ্না ফোন রেখে দিল।

মুর্তজা চেয়ারে বসে থাকলেন। কখন মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে পড়ে গেছেন, তিনি জানেন না। পাশের এটেনডেন্ট এসে তাঁকে টেনে তুললো। সহকর্মীরা দৌড়ে এলো। ডাক্তার এলো। কিছুটা সুস্থ হলে সহকর্মীদের একজন তাঁকে সাথে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিল।

পরদিন সকালে ছেলেমেয়ের অমতে মুর্তজা চারতলার ছাদের সেই চিলেকোঠায় ফিরে এলেন। তিনি ঐদিন স্বপ্নাকে আর ফোন দিলেন না। সারাদিন শুয়েই কাটালেন। মুর্তজা জানেন, স্বপ্না তার স্বামীর সাথে আছে। স্বপ্নাও ফোন করলো না।

শনিবার সকালে মুর্তজা সেতুকে ফোন করলেন। 'কেমন আছো' জিজ্ঞেস করার পর বললেন, তুমি এখন কোথায়?

'আমি আপা-দুলাভাইদের বাসায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এসেছিলাম। এখানেই আছি। দুলাভাইকে প্লেনে তুলে দেওয়ার জন্য আপা ঢাকায় গেছে। দুলাভাই কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধুর সাথে দেশের বাইরে বেড়াতে গেছেন। আপাও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ট্রেনে দুলাভাইয়ের সাথে ঢাকায় গেছে। গত মঙ্গলবার থেকেই বার বার আমাকে আপার অবর্তমানে বাসায় থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। তাই না এসে পারলাম না। আপা না-ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবো। আগামী সোমবার আপার যশোর ফেরার কথা। তারপর আমি বাড়ি ফিরে যাব।'

মুর্তজা তো আগে থেকেই জানে যে স্বপ্না ঢাকায়। এ বিষয় নিয়ে আর আগ্রহ দেখালো না। সেতুর শরীর কেমন আছে, ওষুধ-পথ্য ঠিকমতো খাচ্ছে কি-না, এসব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

রবিবার মুর্তজা স্বপ্নাকে ফোন দিলেন। রিং হলো, ফোন রিসিভ হলো না। কয়েক বার দিলো, রিসিভ হলো না। সোমবার ফোন দিলো। রিং হয়, কেউ ধরে না। মুর্তজা নিজেও তো জানে, হাজি কেরামত বিদেশে পৌঁছে গেছে। তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, কেন স্বপ্না ফোন ধরছে না। মুর্তজা চাচ্ছিলেন, যেহেতু স্বপ্না ঢাকাতে, দুজনে একবার দেখা করা যায় কি না। মুর্তজা ভাবছেন, এ কদিনের মধ্যে স্বপ্না এক মিনিটও ফোন করা কিংবা ধরার সময় পাবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এতে পরিষ্কার যে, সে হাজি কেরামতের সাথে ঢাকা এসেছে তা আমার কাছে লুকাতে চায়। সে তথ্য লুকিয়ে

দুপক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখতে চায়। আমাকে সে তার সংসারের সুখ-শান্তির পথে বাধা মনে করছে। অথচ আমি তার সুখের জন্যই সবকিছু ভাবছি। সে সেখানে সুখী হতে পারলে আমি বাধা হবো কেন? আমি তাতেই সন্তুষ্ট। একথা তো তাকে আমি আগেও বলেছি। আমি সেটাকে আনন্দের সাথে মেনে নেবো। তবে আমাকে খোলাখুলিভাবে বললেই হতো।

সোমবার সকাল থেকে টিভির স্ক্রল নিউজে দেখাচ্ছে যে, ঢাকার সাথে খুলনার রেল যোগাযোগ বন্ধ। যমুনা নদীর কিছু দূর পর পানির তোড়ে মাটি ভেঙ্গে যাওয়াতে রেল লাইন বসে গেছে। মেরামত না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন বন্ধ। ট্রেন ছাড়া স্বপ্নার যাওয়া-আসা হয় না। বাসে চড়লে বমি হয়। সোম, মঙ্গল, বুধ পর্যন্ত মুর্তজা অনেক বার স্বপ্নাকে ফোন দিলো। ফোন রিসিভ হলো না। মুর্তজাও বুঝছে, স্বপ্না এ কদিন ফোন না ধরে ও না-জানিয়ে ফিরে আসতে যেয়ে এখন উভয় সংকটে পড়ে আছে। বুধবার সন্ধ্যার পর মুর্তজা আবারো চেষ্টা করলেন। স্বপ্না ফোন ধরলো। মুর্তজা বুঝলেন, স্বপ্নার ফোন না ধরে আর উপায় নেই। স্বপ্নাও চিন্তা করে দেখছে— দিন বেশি পার হয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কবে ফিরতে পারবে জানা নেই। এভাবে আর কতদিন লুকিয়ে থাকা যায়।

'কী, এ কদিন ফোন ধরছো না কেন? হাসপাতালে ছিলে নাকি?'
'অসুবিধায় ছিলাম।'
'এখন কথা বলতে পারবে?'
'না, একটু বাইরে আছি। পরে কথা হবে। এখন রাখি।'

মুর্তজা ফোন রেখে দিলেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার আর ফোন করলেন না। এর মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক হলো। মুর্তজাও ভেবেছেন, এর মধ্যে স্বপ্না যশোর এসে পৌঁছে গেছে। তথ্য ঢাকার সুযোগ এসেছে।

তারপর শনিবার বিকালে মুর্তজা একবার ফোন করলেন। স্বপ্না ফোন ধরলো।
'কী, ঢাকা থেকে কবে যশোর পৌঁছালে?'
'ঢাকা মানে?'
'না, বলছিলাম কি যে গতকাল ফিরেছো, না গত পরশু ফিরেছো, তাই?'

স্বপ্না অল্পক্ষণ চুপ থাকলো। তারপর বললো, 'আমি স্যরি, তোমাকে জানিয়ে যাবার সময় পাইনি। যাবার আগে তোমাকে একবার ফোনে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তোমার ফোন বন্ধ ছিল। আমি সত্যিই স্যরি। নিশ্চয়ই তুমি খুব মাইন্ড করেছো? ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হওয়াতে ফিরতে দেরী হলো। হঠাৎ এমন কিছু ঘটলো যে আমি না যেয়ে আর পারলাম না। ঐ দিন দুপুরেও জানতাম না যে আমি ঢাকা যাচ্ছি। ওখানে গিয়েও ফোনে যোগাযোগের সময় জোটেনি, স্যরি।'

‘কিন্তু যশোর থেকে ঢাকা যাবার ট্রেনের টিকেট তো দুই দিন আগে না কাটলে পাওয়া যায় না।’

‘না, টিকিট আগেই কেটেছিল। কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কেউ যাবে। আমি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে গেলাম।’

‘হাজি কেরামত এয়ারপোর্ট ছেড়েছে শুক্রবার অথবা শনিবার। তা তুমি ফোন ধরছিলে না কেন? তুমি আমাকে অন্ধকারে রেখে আগে আগে যশোরে পৌঁছে যেতে চেয়েছিলে। যত বিপদে ফেলে দিয়েছিল ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে। এটা তোমার কপাল। ইচ্ছে করলেই সবকিছু লুকানো যায় না। গত বুধবারও তো তুমি জানালে না যে, তুমি ঢাকায় আছো। বললে, একটু বাইরে আছি।’

‘কিন্তু তুমি জানলে কী করে, আমি ঢাকায় গেছি?’

‘কেন, ঐ বৃহস্পতিবার না হাজি কেরামতের দেশের বাইরে যাবার উদ্দেশ্যে যশোর ছাড়ার কথা ছিল? আর তুমি ঐ যে আমাকে ফোনে অপেক্ষা করিয়ে রেখে কাকে যেন ফোনে তোমার ঢাকা আসার কথা বললে। আমি আংশিক শুনে পুরোটুকু বুঝলাম। তারপর তো তুমি হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে ফোনের লাইনটা কেটে দিলে। হয়তো তোমার মনে ছিল না যে, আমি তোমার কথা শুনছি। মনে হবার সাথে সাথেই আমার ফোনের লাইনটা কেটে গেল। আসলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তুমি তখন অসংযত ও অস্থির ছিলে। আমার সাথে তোমার ফোনের কথোপকথনে তা বোঝা যাচ্ছিল। আমার কাছে যে একটা কিছু লুকাচ্ছো এবং আমার সাথে যত তাড়াতাড়ি কথা শেষ করা যায়, তা তুমি চেষ্টা করছিলে— তোমার আচরণে তা বোঝা যাচ্ছিল। কেন, এর আগেও তো আমি দেখেছি, মনে করে দেখো, শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়— তুমি অনেক ক্ষেত্রেই বরাবরই একটু বেশি বুদ্ধি খাটাতে যাও, কিন্তু সেই বুদ্ধির পরিণতি তুমি বুঝতে অপারগ, শেষে ধরা পড়ে যাও। ধরা পড়ার পর কথা ঢাকতে গিয়ে আবার তর্ক কর। তর্ক করে সত্য লুকানো যায় না। তোমার বুদ্ধি ও চিন্তাধারার ব্যাপকতা অনেক কম। তুমি এসব বুঝেও আমাকে নিয়ে এত বুদ্ধি খাটাতে যাও কেন? সেদিন আমি বলছিলাম, আমার খুব খারাপ লাগছে, মাথার মধ্যে পাক দিচ্ছে, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব। আর তুমি বার বার দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে বলছিলে। তুমি ঢাকায় আসছো, অন্যকে বলছো অথচ আমাকে বলছো না, ভেবেই আমার মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠেছিল। তোমার তা শোনার সময় ছিল না। আমি বলছিলাম, বসতে পারছিনে, মাথাটা খুব ঘুরছে। আর তুমি বার বার বলছিলে, খেয়ে নাও। আমি ক্রমশই তোমার সাংসারিক সুখের পথে বাধা হয়ে উঠছি। তুমি যেভাবে সুখী হও, তাতেই আমি খুশি। আমার মতো একজন অল্প বেতনভোগী ক্ষুদ্র কলেজশিক্ষককে নিয়ে তোমার অতো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমার কাছে লুকানোরও কিছু নেই।’

‘না, আমি তো ফোন বন্ধ করিনি। হয়তো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আসলে তোমাকে না বলতে আমি চাইনি। সময় করে উঠতে পারিনি। আমার মাথাটা মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়, কী করতে কী করি বুঝিনে। কিছু মনে কোরো না, প্লিজ।’

‘এ কদিনে একবার অন্তত একটু জানাতে পারতে। তোমার মেয়ে, ছেলেবউ কখনো ওয়াশরুমে যায় না? গোসল করতে বাথরুমে ঢোকে না? তখনো তো আমাকে একবার এক মিনিটে জানাতে পারতে। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম ফোন দিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি ধরছো না, সময় পাচ্ছো না। কী অবাক পৃথিবী! তুমি কি এগুলোও আমাকে বিশ্বাস করতে বলছো? স্বীকার করতে অসুবিধা কোথায় যে, তুমি আসলে চেয়েছিলে তোমার ঢাকা আসার তথ্যটা গোপন রাখতে।’

‘তো তুমি কি তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে চাচ্ছো? সম্পর্ক আর রাখতে চাও না, এই তো?’

‘আমার মনে হচ্ছে আমি না চাইলেও তুমি তাই চাচ্ছো। নইলে তুমি স্বেচ্ছায় এ প্রসঙ্গ উঠাচ্ছো কেন? ফোন না করতে হলে তুমি রক্ষা পাও, এটা আমি বুঝি। আমি তোমাকে আসলেই উভয়সংকট ও অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিয়েছি। তো, আমাকে তোমার অসুবিধার কথাটা সোজাসুজি বলে দিলেই পারো। এত ঘোরপ্যাঁচ করার কী আছে? তুমি নিশ্চিত থাক, আমি মনে কিছু করবো না। তোমার সুখের পথে বাধা কখনোই হব না।’

মুর্তজার স্পষ্ট কথায় স্বপ্না হতচকিত হয়ে গেল। কী উত্তর দেবে বুঝে উঠতে পারলো না। কিছুক্ষণ চুপ থাকলো, তারপর বললো, ‘প্লিজ, আমাকে এবারের মতো মাফ করে দাও। আমি ইচ্ছে করে এটা করিনি। আমি তো সব কথাই তোমাকে বলি। কেন যে এমনটি হলো! তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারিনে। তুমি যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে আমি আর বাঁচবো না। তুমি কি জানো না, তুমি আমার সব? তুমি ছাড়া যে আমি আর কিছুই ভাবতে পারিনে। তুমি একটু শান্ত হও, প্লিজ।’

‘কে কার শোকে বাঁচবে না, এটা এ জগতে বলা খুব কঠিন। তবে কে বাঁচবে, কে বাঁচবে না, আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি। একটা গল্প বলি, শোনো: ছোটোবেলায় যাত্রা প্যান্ডেলে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম। চারদিকের অনেক প্রতারণায় রাজা খুব মুহ্যমান, ভগ্নদশা। যাকে জীবনে খুব বিশ্বাস করেছিলেন, কাছের সেই লোকটা বেঈমানি করলো। বিবেক লম্বা সুরে একটা গান গাইতে গাইতে স্টেজে ঢুকলো। দর্শকরা নিশ্চুপ। বিবেক টানা সুরে গেয়ে চললো, ‘পথিক আপন বুঝে চলো-ও এ-এ-এই বেলা-আ। ও পথিক আপন বুঝে চলো-ও, এ-এ-এই বে-লা-আ...।’ জীবনে কেউ কেউ আপনকে চিনতে পারে, কেউ আবার স্বার্থ ও পয়সাকড়ি চেনে। যার যেমন

রুচি, অভিরুচি— সে সেটাই বিবেচনা করবে। আমারও আপনকে চেনার সময় এসেছে। আমার এক আত্মীয়া বুড়ি-বয়সে বলতেন, 'আল্লাহ আমার বিপদ দাও, আমি আপনকে চিনতে চাই।' যা হোক তুমি ভালো থাকো এটা আমি চাই।'

কথা শেষ করে মুর্তজা যেন অথর্বের মতো বসে থাকলেন। স্বপ্নার তথ্য গোপন করার চেষ্টা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্বপ্না যে অতীতেও তাঁর কাছে বিভিন্ন তথ্য বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে এটাও তার বিশ্বাসে এসেছে। তিনি বুঝেছেন, স্বপ্না মোবাইল ফোনের যুগ হওয়ার কারণে ভুল তথ্য দিয়ে বছরের পর বছর তাঁকে আশান্বিত করে রাখছে। হাজি কেরামতের তথ্য নিয়ে তালবাহানা করছে। দ্বৈত ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, দ্বৈত অভিনয়ও করছে। স্বপ্না হাজি কেরামতের নিন্দা, অবনিবনা মাঝেমধ্যেই বলে, তার সাথে সম্পর্কেরও ভিন্ন ও বিকৃত তথ্য দেয়, আবার ভিতরে ভিতরে তাকে জীবনের শেষ অবলম্বন হিসেবে হৃদয় আসনে বসায়, আর মুর্তজাকে বিকল্প আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়ে বদলি খেলোয়াড়ের মতো রাখে। মুর্তজা এতে নিজেকে উপেক্ষিত মনে করেন। হাজি কেরামতের কথা স্বপ্না অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, তার সন্তুষ্টিকে প্রথম অগ্রাধিকার দেয়, আবার তার সাথে ভালো সম্পর্কের কথা পুরোপুরি অস্বীকারও করে। তিনি এখন সবই বুঝতে পারছেন। মুর্তজার এখন মনে পড়ে, কিছুদিন আগেও স্বপ্না পর পর আরো দুবার হাজি কেরামতের কথা মানতে গিয়ে মুর্তজাকে যারপরনাই ভুগিয়েছিল, কষ্ট দিয়েছিল, বিপাকে ফেলে দিয়েছিল। হাজি কেরামতের কথা শুনলে যে যা-ই বলুক, সেদিকেই সে ঝুঁকে পড়ে। পরে একটা কিছু বলে ঢাকার চেষ্টা করে, তর্ক করে এবং ধামাচাপা দেয়। হাজি কেরামতের সাথে তার সম্পর্কের এক বিন্দুও ঘাটতি হতে দেয় না। স্বপ্নার কোনো কাজে ভবিষ্যতেও হাজি কেরামত যেন কিছু বিরূপ ধারণা, এমন কি বিরূপ কল্পনাও না করতে পারে এমন আলামত সম্পর্কেও স্বপ্না খুব সচেতন। সেজন্য হাজি কেরামতের কথার গুরুত্ব সে খুব বেশি দেয়, আবার বিভিন্ন ভালো কথা শুনিয়ে মুর্তজাকেও হাতে রাখে। হাজি কেরামতের সাথে তার সম্পর্কের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সুবিধা-অসুবিধার শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই তারপর পারলে এক পা এগোয়, নইলে এড়িয়ে যায়। এগুলো দিনে দিনে মুর্তজার সামনে প্রমাণসহ ধরা পড়েছে। এতে মুর্তজা অপমানিত ও অবহেলিত বোধ করলেও স্বপ্নাকে কিছুই বলেননি, মনে মনে আছেন। কোনো প্রতিবাদও করেননি। নীরবে সবই হজম করেছেন। কারণ মুর্তজা তাঁর সম্ভাব্য পরিণতি আগেই ঠিক করে রেখেছেন। মুর্তজা বুঝে ফেলেছেন, পুরোনো পচা-শামুকে তাঁর পা কেটে ইতোমধ্যেই রক্ত ঝরা শুরু হয়ে গেছে, তাঁর ফেরার আর পথ নেই।

মুর্তজা মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ডের রেকর্ডকৃত একটা গানের বাটনে টিপ দিলেন। গানটা ভেসে

আসতে লাগলো। মুর্তজা উদাসীন হয়ে যাচ্ছেন। মানুষ একটা প্যাঁচানো বুদ্ধি ঢাকতে গিয়ে এত মিথ্যার আশ্রয় নেয় কেন? মানুষ এত স্বার্থপর হতে পারে! গানের একাংশের দিকে মুর্তজার কান গেল:

'প্রতিদিন কত খবর আসে যে কাগজের পাতা ভরে
জীবনপাতার অনেক খবর রয়ে যায় অগোচরে,
কেউ তো জানে না প্রাণের আকুতি বারে বারে সে কী চায়
স্বার্থের টানে প্রিয়জন কেন দূরে সরে চলে যায়,
ধরণীর বুকে পাশাপাশি তবু কেউ বুঝি কারো নয় ...।'

স্বপ্নার কথার সাথে কাজের অমিল তো এর আগেও মুর্তজা অনেক বার দেখেছেন। যদিও স্বপ্না তর্ক করে, কখনো গায়ে হাত বুলিয়ে সবকিছু উড়িয়ে দেয়। এবার 'পড়বি পড় মালির ঘাড়েই, সে ছিল গাছের আড়েই'। শেষ বয়সে এসে জীবনের এ আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রতারণা মুর্তজার সইতে খুব কষ্ট হয়। মুর্তজার ভগ্ন শরীর, মাস্টারি পেশা ইত্যাদি বিবেচনা করলে মুর্তজার যত কষ্টই হোক বলতে ইচ্ছে করে, 'স্বপ্না তোমার আসার দরকার নেই, তুমি ভালো থাকো, আমাকে নিয়ে আর আত্মপ্রবঞ্চনা করো না। তুমি অন্তরের সত্য কথাটা আমাকে অন্তত বলো।' কিন্তু স্বপ্না তো এতে রেগে যাবে, আবারো মুর্তজাকে প্রতারক বলবে। তাছাড়া মুর্তজাও স্বপ্নাকে নিয়ে জীবনে নিভু নিভু আশায় একটু সুখের চেষ্টা করছিলেন। সুখের স্বপ্ন তো তিনি অতীতে অনেকবার দেখেছেন, যদিও তা ছিল দুঃস্বপ্ন। তিনি নিজেকে অনেকভাবে প্রশ্ন করে দেখেছেন। তাঁর মন বলে, তিনি স্বপ্নাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। শেষবিকেলের এই দিনগুলিতে স্বপ্নাকে ছাড়া জীবনের কিছুই আর ভাবতে পারেন না। স্বপ্নার সাথে তার জীবনের অনেক অকথিত স্মৃতি জড়িত, জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে স্বপ্নার স্মৃতি। এ জীবনে এসব স্মৃতি ভোলা সম্ভব নয়। প্রতিটি কাজে ও কথায় এগুলো মনে হয়, খুব কষ্ট লাগে। স্বপ্নার স্বপ্ন তাঁর অন্তরের নিরন্তর জপমালা। সেই স্বপ্না আজ তাঁকে প্রবঞ্চনা করছে, যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। অথচ স্বপ্নার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। যদিও স্বপ্নার ইচ্ছার বাইরে তিনি কিছুই করতে চান না, তাঁর কষ্টের বোঝা স্বপ্না না নিলেও তাঁর কোনো দুঃখ নেই। তাঁর দুঃখের বোঝা তিনি নিজেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহনে সক্ষম। তিনি জীবনের শেষ বেলায় এসে শুধু স্বপ্না কেন, কারো প্রতিই ভরসা করেন না। তিনি জীবনের যে কোনো পরিণতির জন্য সব সময় প্রস্তুত। তবু স্বপ্নার এই দ্বৈত অভিনয়, তথ্য গোপন, লুকোচুরি মুর্তাজার কাছে পছন্দনীয় নয়। মুর্তজার মনে হয়, স্বপ্না প্রথমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কোনো কিছু ভেবে সে তার সিদ্ধান্ত থেকে মনে মনে পিছিয়ে এসেছে– তা সে মুখ ফুটে প্রকাশ করছে না। তার কাছে মুর্তজা এখন 'থাকে লক্ষ্মী, যায় বালাই'

হয়ে গেছে। তাঁর ধারণা, বর্তমানে স্বপ্না মনে মনে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করছে সেগুলো এরকম:

এক. মুর্তজার শারীরিক অবস্থা ভালো না, স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে। অন্যদিকে, হাজি কেরামত বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। প্রতিটা নারী স্বামীর দীর্ঘজীবী হওয়ার নিরাপত্তা চায়, সেক্ষেত্রে মুর্তজা অযোগ্য।

দুই. মুর্তজা একজন সাধারণ কলেজশিক্ষক। সামাজিক ক্ষমতার বলয়ে মুর্তজার অবস্থান দুর্বল। সমাজে তাঁকে কেই-বা চেনে! অথচ হাজি কেরামত স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চস্তরে আছে। সেখানেও মুর্তজার অযোগ্যতা।

তিন. প্রবাদে আছে, 'কোন বিড়ালের হয় মাছে অরুচি? আর কোন নারীর হয় গয়নাগাটিতে অরুচি?' মুতর্জা আর্থিকভাবে দুর্বল। স্বপ্না তার আলমারি খুললেই লাখ লাখ টাকার চেক, নগদ অর্থ, গয়নাগাটি দেখতে পায়। ব্যাংক ভরা কোটি কোটি টাকার শুধু ফিক্সড ডিপোজিট। যেদিকে তাকায় টাকা আর টাকা। কোনো কারণে হাজি কেরামত মারা গেলেও স্বপ্না সেসব সম্পত্তির যোগ্য উত্তরাধিকারিণী। সেখানেও মুর্তজার অযোগ্যতা। মুর্তজার কাছে এলে এসব পাওনা সম্পদ পিছনে ফেলে আসতে হবে।

তো, এ জীবনে স্বপ্না মুর্তজার ভালোবাসার মূল্য নাই-বা দিলো! দূর থেকে কথা বলে, ভালোবাসার ছলনা করে সময় যতোটা পার করা যায়, বুদ্ধি করে ফোনের মাধ্যমে যতটুকু তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেটাই স্বপ্নার কাছে যথেষ্ট।

ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ক্রমশই স্বার্থের নিগড়ে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে।

মুর্তজা ভাবলেন, কথাগুলো তো সবই সত্য। স্বপ্নাও নিশ্চয়ই এগুলো ভেবেছে। সত্যিই যোগ্যতার বিচারে তিনি অযোগ্য। তাঁর শরীর ভেঙেছে তো আজ কয়েক বছর ধরে, স্বপ্নার সাথে দেখা হবার পর থেকে এবং তা স্বপ্নার কারণে, স্বপ্নার চিন্তায়। স্বপ্না চলে এলে এ ভাঙা শরীর তো আবার ভালো হয়ে যেতেও পারে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিত্ত-বৈভব বিষয়ে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই। তিনি তাঁর নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কালো টাকার দিকে ঝুঁকতে পারবেন না। এটা তাঁর অযোগ্যতা। তবে, ভালোবাসা কি শুধু টাকা ও ক্ষমতার গণ্ডিতে আবদ্ধ? — মুর্তজার মনে প্রশ্ন জাগে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, ভালোবাসা স্থান, কাল, পাত্র ভেদাভেদ মানে না, বয়সও মানে না। এগুলো কিছুই ভালোবাসার পথে বাধা নয়। শুধু সংসার কেন, ভালোবাসার জন্য মানুষ সিংহাসন ছেড়েছে, তাজমহল গড়েছে, সৃষ্টির প্রথম থেকেই অসংখ্য আশেক-মাশুক একে অন্যকে ভালোবাসতে গিয়ে, ভালোবাসার মূল্য দিতে গিয়ে প্রয়োজনে

আত্মাহুতি পর্যন্ত দিয়েছে। ভালোবাসার রাজ্যে অবাস্তব বলতে কিছু নেই। ভালোবাসার মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ কতটুকু জড়িত, একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার গভীরতা কত, কে কতটুকু ত্যাগে প্রস্তুত— এটাই পরিণতির নিয়ামক। ভালোবাসা টাকা ও ক্ষমতা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, মনের দামে মনকে কিনতে হয়। স্বপ্না তাঁর ভালোবাসাকে কীভাবে বিবেচনা করেছে সেটাই দেখার বিষয়। হাজি কেরামত, তার অর্জিত অঢেল বিত্ত-বৈভব, সবকিছুই তার সুখচ্ছবি। সে যদি মুর্তজার ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে, তাঁকে ছেড়ে হাজি কেরামত ও তার সম্পদকে আঁকড়ে ধরে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে বলে মনে করে, সে-ক্ষেত্রে মুর্তজার আর কীই-বা বলার আছে! স্বপ্না মুর্তজার ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করতে অতীতেও ব্যর্থ হয়েছে এবং এখনো তুচ্ছ ভেবে পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।

মুর্তজা আরেকটা জিনিস ভাবলেন, স্বপ্নার শরীরের অবস্থাও তো ভালো না। সেও যদি খোদা না খাস্তা পরপারের ডাকে চলে যায়! এতো সম্পদের গর্ব, সম্পদের উত্তরাধিকার হবার বাসনা, হাজি কেরামতকে নিয়ে কেরামতি তখন তার কোথায় থাকবে? তার চোখ বোজার চল্লিশ দিনের মধ্যেই হাজি কেরামত 'শুভ দ্বিতীয় বিবাহ' অনুষ্ঠানের আয়োজন ধুমধামের সাথে করবে। আসলে আমরা সবাই আজকের খবরটা পর্যন্ত রাখতে পারি, আগামীকালের খবর আগামীর পাতায় লেখা, পড়ার সাধ্য আমাদের নেই। এটা স্বপ্নার বোঝা উচিত ছিল।

স্বপ্নার 'তুমি কি তাহলে এখন আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে চাচ্ছো?' কথাগুলো মুর্তজার মনে দারুণভাবে আঘাত দিয়েছে। মুর্তজা ভাবছেন, তাহলে স্বপ্না তাঁর সাথে সম্পর্ক শেষ করে দিতেও মানসিকভাবে প্রস্তুত। মুর্তজা এর আগেও বিভিন্ন সময় দেখেছেন, স্বপ্নার বুদ্ধি হালকা, তবে আত্মবুদ্ধির দৃঢ়তা অনেক বেশি এবং চিন্তার গভীরতা ও অনুভূতি বেশ কম। ভালোবাসার মর্ম বোঝে না, মর্যাদাও দিতে জানে না। সে তার পক্ষে একটা খোঁড়া ও অসার যুক্তি দাঁড় করিয়ে সেটাতে অটল থাকে। এদেশে অনেক খুনি আছে, খুন করার পর বিশ হাত দূরে গিয়ে লোকটা মরলো কি-না, কিংবা মরার আগে কতটা ছটফট করছে, তা পিছন ফিরে দেখে। স্বপ্না কিন্তু কখনো পিছন ফিরে দেখে না। এটা তার জীবনে টিকে থাকার জন্য একটা বড় গুণ। স্বপ্নার এ মৌখিক ভালোবাসাকে ভালোবাসা বলা যায় কিনা— এটাও মুর্তজার একটা জিজ্ঞাসা। যে ভালোবাসা ত্যাগের তুলনায় স্বার্থের নিগড়ে বাঁধা, আর যা-ই হোক, ভালোবাসা না বলে এটাকে স্বপ্নার ভালোলাগা বলা যায়। এটা স্বপ্নার অবসর সময় কাটানোর একটা বিকল্প পথ। 'টিকে থাকলে ভালো, না থাকলে আরও ভালো' ধরনের নির্বিকার মনোভাব। স্বপ্না মুর্তজাকে নিয়ে যে লুকোচুরির খেলা শুরু করেছে, তা দেখে ও বুঝে তিনি এসব অশালীন ও সন্দেহমূলক কথা মাথায় আনতে বাধ্য হচ্ছেন।

মুর্তজার কথা, তিনি তো কোনোদিনই স্বপ্নাকে তার সংসার ছেড়ে চলে আসার জন্য চাপ দেননি, বরং তিনি স্বপ্নাকে সুখী দেখতে চান। তিনি নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। স্বপ্নাই প্রথম থেকে মুর্তজার সাথে সংসার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। মুর্তজা অমত করেননি। স্বপ্না তাঁর কাছে এসে সুখী হলে তিনি তাতে রাজি। স্বপ্নার সংসার ছেড়ে আসতে কিংবা হাজি কেরামতকে ছেড়ে আসতে কোনো অসুবিধা থাকলে সেটাও মুর্তজাকে খোলামেলা বলতে পারে। এমনও বলতে পারে, 'এই শেষ বয়সে আর নতুন করে ঘর বাঁধা সম্ভব হচ্ছে না, বরং যতদিন বাঁচি দুজনে একে অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে বন্ধুর মতো পাশাপাশি থাকবো।' সত্য বলতে, তাতেও মুর্তজার কোনো আপত্তি নেই। মুর্তজা তার কাছ থেকে নির্ভেজাল বিশ্বস্ততা চায়। কিন্তু জীবনের এই শেষবিকেলে এসে তাঁকে নিয়ে এই প্রবঞ্চনা কেন?

স্বপ্না কী ভেবে প্রথম থেকে এটা করে যাচ্ছে মুর্তজার বোধগম্য নয়। মুর্তজা প্রথম থেকেই জানে যে স্বপ্না ধনীর স্ত্রী। তাই মুর্তজা উপযাচক হয়ে কখনোই স্বপ্নার আসার প্রস্তাব দেননি। কিন্তু বিষয়টা বুঝতে পারার পর নিজের কাছে তাঁর খুব খারাপ লাগছে। নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে, নিজেকে অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবছেন। স্বপ্না ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করছে বলে তাঁর প্রতি স্বপ্নার ভালোবাসা নিয়েও সন্দেহ হচ্ছে। মুর্তজা যে স্বপ্নাকে প্রথম জীবন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে যেতে চান, এসব ঘটনা সে-মনোভাবে ক্ষত সৃষ্টি করছে। মুর্তজা বোঝেন যে, স্বপ্না এ ধরনের হালকা বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে তার জীবনের এমন এক ত্যাগী আপনজনকে হারাচ্ছে, যার মর্ম সে নিজে বুঝতে অপারগ এবং ভবিষ্যতেও কখনো বুঝবে না।

এসব দুশ্চিন্তায় মুর্তজা খুব ভেঙে পড়েছেন। শক্ত মানুষ বলে মুখ দেখে বোঝা যায় না। কারো কাছে ধরাও দেন না, হেসে হেসে কথা বলেন। ভিতরে ভিতরে বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। ওষুধ যেগুলো খাচ্ছিলেন, শুধু ঘুমের ওষুধ বাদে সবই ছেড়ে দিয়েছেন। শরীরের দিকে কোনো খেয়াল নেই। কেনই-বা তিনি শরীরের যত্ন নেবেন? কার জন্য তিনি বাঁচার চেষ্টা করবেন? জীবনটা এভাবেই যে-কদিন চলে, চলুক। এই তো তিনি ভালোই আছেন!

মুর্তজা একদিন পর বিকালে ফোন দিলেন। কে কেমন আছে, কার শরীরটা কেমন— এমন অনেক কথাই আলাপ হলো। কিন্তু আলাপচারিতায় কোনো আন্তরিকতার ছোঁয়া এলো না।

পরদিন সন্ধ্যার পর স্বপ্না ফোন করলো। 'কেমন আছো' জিজ্ঞেস করলো। মুর্তজা উত্তর দিল, 'ভালো'।
'আমার প্রতি তোমার রাগটা মনে হয় এখনো যায়নি? প্লিজ মনে কিছু কোরো না। তোমার শরীরটা নিশ্চয় খারাপ। তবু আমার কাছে বলছো না। আসলে তোমার তিলে

তিলে শেষ হয়ে যাবার পিছনে আমিই দায়ী। আমি তোমাকে শেষ করে দিচ্ছি। তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসো তা আমি জানি। দেখি কী করতে পারি, আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরো, প্লিজ। ঐ লোকটা দেশে ফেরার আগে তোমার সাথে কোথাও না কোথাও দেখা করতে চেয়েছিলাম। খুব চেষ্টা করছি। আশা করছি দেখা হবে। অনেক কথা বলবো। তোমার দেখার জন্য মনটা ছটফট করছে। আমি কবে আসছি কিংবা তোমাকে আসতে বলছি, দু-এক দিনের মধ্যে জানাচ্ছি। তুমি আমার উপর রাগ করো না, প্লিজ।' স্বপ্না বললো।

'না, তুমি আর কী করতে পারবে! তোমার আর করার কীই-বা আছে। সবই আমার নিয়তি। তোমার কোনো দোষ নেই। প্লিজ, আমাকে আর কোনো আশা দিও না। তোমার তো বাঁচার একটা শক্ত অবলম্বন দরকার, এটা আমি বুঝি। তুমি তোমার জীবনে হাজি কেরামতকে ছেড়ে আসতে কোনোদিনই পারবে না এবং সে ইচ্ছেও তোমার নেই। তুমি তাকে জীবনের শেষ সম্বল ভেবেছো, তোমার বিভিন্ন কাজে ও কথার রকমফেরে এটাও আমার কাছে পরিষ্কার। তবে তুমি তো বলতে পারবে না যে, আমার কাছে আসার জন্য আমি কোনোদিন তোমাকে চাপ দিয়েছি, কিংবা প্রলোভিত করেছি? তাহলে আমার সাথে এতো ছলনা কেন? আমি তো তোমার সুখের সংসারে কোনোদিনই বাধা হতে চাইনি?'

'তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস কোরো না, দূরে ফেলে দিও না। দেখি, ঐ লোকটা এবার ফিরে এলে আমি একটা সিদ্ধান্ত নেব। গতকাল মেয়ের ফোনে ফোন করেছিল। বলেছে, আগামী ছাব্বিশ তারিখে দেশে আসছে। এখনো পনেরো দিন আছে। আমার সাথে কোনো কথা হয়নি। আমিও বলিনি।'

মুর্তজা হাজি কেরামতের বিষয়ে এবং স্বপ্নার সাথে হাজি কেরামতের কথার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। শুধু বললেন, 'সে কবে আসবে, তোমার সাথে কথা হয়েছে কী হয়নি, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য ব্যাপার। তুমি তো এ পর্যন্ত দেখে আসছো, হাজি কেরামতকে আমি কোনোদিন খারাপ বলিনি। এদেশ হাজি কেরামতের মতো লোকে ভরে গেছে। অসৎ লোক বলে আমি তাকে ঘৃণা করি বটে, তবে তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোনো রাগ বা প্রতিহিংসা নেই। তুমি সেখানে সুখে আছো শুনতে পেলে আমি নিজেকে সুখী ভাববো। তাকে আমার প্রতিযোগী কখনোই ভেবো না। তার ও আমার চিন্তাধারা, জীবনপথ ও পাথেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজনীতির সেতুবন্ধ, সম্পত্তি ও কোটি কোটি টাকা তার পাথেয়। অন্যদিকে, আমার সম্পদ দেশ-বিদেশব্যাপী অগণন শুভানুধ্যায়ী ছাত্র-ছাত্রী। তা কোনোদিনই এক হতে পারে না। আমাকে নিয়ে ভেবো না। সময়ই আমার সিদ্ধান্ত বলে দেবে। 'পথ চিরদিন সাথী হয়ে রয়েছে আমার।'

৯.

হাজি কেরামতের বাড়ি ফেরার পনেরো দিনেরও দশ দিন পেরিয়ে গেছে। স্বপ্নার মুর্তজার সাথে দেখা করার আর কোনো কথা নেই। প্রায়ই দু জনের কথা হয়। মুর্তজাও দেখা করার বিষয়ে কোনো কথা বলেন না। স্বপ্না কিছু বলে কিনা মুর্তজা অপেক্ষায় আছেন। শেষে অপেক্ষার দিনও শেষ। চব্বিশ তারিখ সন্ধ্যায় স্বপ্না ফোন করলো। মুর্তজা বিছানায় শুয়েছিলেন। ফোন ধরলেন।

'কেমন আছো?' মুর্তজার কণ্ঠস্বর।

'শরীরটা ভালো না, গত রাত থেকে জ্বর। মাথাটাও ব্যথা করছে। শুয়ে শুয়ে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার সাথে কথা না বলতে পারলে ভালো লাগে না। তাই ফোন করলাম। তুমি কী করছো?'

'আমি শুয়ে আছি। জ্বরের জন্য ওষুধপত্র কিছু খাচ্ছ? জ্বর এলে তো তুমি খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ করে দাও। ওটা কোরো না। বেশি করে লিকুইড খাও। সকালেই আমাকে তোমার জ্বরের খবরটা জানাতে পারতে। তুমি এতো কষ্ট করছো আর আমাকে খবরটা দিচ্ছ এই সন্ধ্যায়।'

'দিইনি, কারণ তুমি জানলে শুধু শুধু টেনশন করবে, তাই।'

'হ্যাঁ, দূরে থেকে আমি তোমার জন্য এই টেনশন ছাড়া আর কীই-বা করতে পারি!' মুর্তজা খেদোক্তি করলো।

'তুমি চিন্তা কোরো না, রাতের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি তো জানো, ছাব্বিশ তারিখ ঐ লোকটা দেশে আসছে। মেয়েটার দুই দিন ছুটি আছে, সে ঢাকায় যেতে চায়। আমি কিন্তু এবার কোনোক্রমেই ঢাকায় যাব না। ঐ লোকটা মেয়েকে দিয়ে যতই বলাক না কেন, যাব না। শরীরটা খারাপ, তাছাড়া এতো পথ জার্নি করে যাওয়া-আসা শরীরে আমার কুলায় না। আমার সাথে তো কথাও হয় না, বললে মেয়েকে বলবে। আমি কিন্তু যাব না।'

'এটা তো তোমার ব্যাপার। আমি কী বলতে পারি? তুমি যাবে না বলেছো, ব্যস, এই তো হয়ে গেল।' মুর্তজার এড়িয়ে যাবার মতো উত্তর।

'যাবই-বা কেন? সে তার ব্যবসায়ী বন্ধুদের সাথে গেছে। তাদের সাথে একবারে যশোরে চলে এলেই হয়। তা আবার আনতে যাওয়া কেন?'

'ঠিক আছে, তোমার শরীর খারাপ। তুমি বিশ্রাম নাও।'

মুর্তজা ফোন রাখলেন। কিছুক্ষণ পর মুর্তজা সেতুকে ফোন দিলেন। কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন। সেতু বললো, 'আপনি কেমন আছেন? আমার কেন জানি মনে হচ্ছিলো, দাদা আজ ফোন করবেন। কতদিন আপনাকে দেখিনি। কয়েক দিন থেকে আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'না, আমি খুব ভালো নেই। সেদিন চেয়ার থেকে পড়ে যাবার পর থেকেই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কলেজে বেশি সময় থাকিনে। বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিই। শরীর যে আর চলে না! জীবনের প্রতি আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়েছি। যাবার আগে তোমার মুখখানা একবার দেখে যাবার ইচ্ছে আছে। জানিনে সে ইচ্ছে পূরণ হবে কী না?'

'তোমার দুলাভাইয়ের বাসা পাহারা দিতে আর যাচ্ছ না?' মুর্তজা জানতে চাইলেন।

'না, এখনো ডাক পড়েনি। মনে হচ্ছে ডাক এবার পড়বেও না। আজ আপার সাথে কথা হলো। আপা বললেন, দুলাভাইয়ের সাথে তার কথা হয়েছে। দুলাভাই বলেছেন, ফেরার পথে বন্ধু ব্যবসায়ীদের সাথে একবারে এয়ারপোর্ট থেকে নেমে যশোর চলে আসবেন বলে ভাবছেন। ঢাকায় ছেলের বাসায় এবার যাবেন না।'

'তাহলে তুমি তো এবার বাড়ি পাহারা দেওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলে!'

'তা যা বলেন। আমি গরিব মানুষ। তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধা থাকে। শরীরটাও ভালো থাকে না। আমার জ্বালা আমি বুঝি। এর মধ্যে আবার কখনো কখনো বিশেষভাবে ডেকে পাঠায় তাদের বাসার কোনো কাজের জন্য। আমি সুস্থ আছি, কী নেই, জানতেও চায় না। বললেও বিশ্বাস করে না। আমি পড়ে যাই মহাবিপদে। ডাক পড়লে বাড়ি পাহারা দিয়ে, কখনো বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের মন জয় করি। কিন্তু আমার কষ্টটা আমার আপাও বোঝে না। যশোরে আবার যেতে হতেও পারে। আজ রাতে দুলাভাই আপাকে ফাইনাল সিদ্ধান্তটা জানাবে বলে বলেছে। তবে আপাকে না যেতে বলার সম্ভাবনাই বেশি।'

'এটা ধনীদের বৈশিষ্ট্য। তোমার দিকটা আদৌ বিবেচনায় আনবে না। এটাকে মেনে নিয়েই পারলে তার সাথে সম্পর্কটা রেখো। যত যাই হোক না কেন, মার পেটের বোন তো। গরিব হলে ধনীদের মন একটু জুগিয়েই চলতে হয়। আচ্ছা, আগামীকাল আবার কথা হবে। আমার জন্য দোয়া কোরো।'

মুর্তজা ফোন রেখে দিয়ে ভাবলেন, জগতে মানুষ চেনা অনেক কঠিন। এজন্যই স্বপ্না আগে আগেই বলছে যে, ঐ লোকটা বললেও আমি যাব না।

পরদিন সকাল দশটায় মুর্তজা স্বপ্নাকে ফোন দিল। শরীরে জ্বর আছে কি নেই জিজ্ঞেস করলো। হাঁটাচলা করতে পারছে কিনা জানতে চাইল।

'শরীরটা ভালো লাগছে না, এখনো জ্বর জ্বর লাগছে, মাথার পিছনটা ব্যথা করছে, মনে হচ্ছে প্রেসার বেড়ে গেছে' ইত্যাদি বলে খুব অনুরক্তের সুরে স্বপ্না উত্তর দিল। আরো বললো, 'সকালে ঐ লোকটা মেয়েকে ফোন করেছিল, যেতে হবে কি হবে না, সে এখনো ভাবছে। আমি মেয়ের মাধ্যমে বলে দিয়েছি, আমি যেতে পারবো না। আমার শরীর খারাপ। আর হ্যাঁ, আমি মিথ্যে বলবো না। তার এক আত্মীয়ের বিয়ে। সেখানে যাওয়া লাগবে কী লাগবে না, অনেক দিন পর আজ এই কথাটা আমি সংক্ষেপে ফোনে শুনে নিয়েছি, যাতে পরে আমার দোষ না দেয়।'

স্বপ্না আহ্লাদের সুরে এবার বললো, 'কী যে করি, কিছুই ভালো লাগছে না। শুধু তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। একদম ভালো লাগছে না। ঐ লোকটা দেশে ফেরা মানে আবার ঝামেলা বেঁধে যাওয়া। এখন তো যে কোনো সময় মনোমতো ফোন করতে পারছি, ধরতে পারছি। তখন তো আর তা হবে না। তোমার শরীরটা কেমন?'

'আমি ভালো আছি। কয়েক দিনের মধ্যে পুরোপুরি ভালো হয়ে যাব। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। নিজে ভালো থাকো। শরীরটা সুস্থ করো, ঠিকমতো খাও। প্রেসারটা মাপাও। ঠিকমতো ওষুধ খেয়ো। তোমার এই অসুস্থ শরীরের কথা ভাবতে গিয়ে রাতে আমার ঘুম আসেনি। তাই এই সকালবেলা ফোন দেয়া। ভালো থাকো। পরে কথা বলবো।'

মুর্তজা কলেজে বেরিয়ে গেলেন। শরীরটা আর চলছে না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো হচ্ছেন, তবু গেলেন। বিকালের আগেই ফিরে এসে রুমে একাকী শুয়ে আছেন। শেষ বিকেলের দিকে স্বপ্নাকে একবার ফোন দিলেন।

'এখন তোমার শরীরটা কেমন?'

'জ্বর আছে কী নেই বুঝতে পারছিনে। তবে শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। প্রেসার মেপেছি, বেশি। দুপুরে ওষুধ খেয়েছি, রাতে আবার খাবো। এখন বিশ্রাম নিচ্ছি।'

'তো, বিশ্রাম নিতে থাকো। শুধু তোমার শরীরটা এখন কেমন, তা জানার জন্য ফোন দিয়েছিলাম।' মুর্তজা ফোন রাখলেন।

পরের দিন সেপ্টেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ। মুর্তজা অফিসে। সকাল আনুমানিক এগারোটা। স্বপ্নার শরীরটা কেমন আছে শোনার জন্য মুর্তজা ফোন দিলেন। স্বপ্না

ফোন ধরলো, কিন্তু ফোনের মধ্যে শব্দ ভেসে আসছে। মুর্তজা বুঝলেন, স্বপ্না বাইরে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথায়?'

'আমি এখন ট্রেনের মধ্যে, ঢাকায় যাচ্ছি। আটাশ কিংবা ঊনত্রিশ তারিখে ফিরবো। এর মধ্যে আর কোনো কথা হবে না। ফিরে এসে কথা বলবো। আচ্ছা রাখি।'

মুর্তজা অবাক ও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তিনি ভাবছেন, 'আচ্ছা, স্বপ্না কি হাজি কেরামতের হাতের পুতুল? তার কি নিজস্বতা বলতে কিছুই নেই? না-কি তার মনের বিষয়টা প্রকাশ করে না, অথবা আমি একটা নিম্নমানের বেকুব? না-কি আমিই তার আসল রূপ চিনতে পারছিনে? হয়তো এটাই তার মনের চাওয়া। এটাই তার প্রকৃত রূপ। গত বছরও ছেলের বাসায় এসে ডাক্তার দেখিয়েছে, চিড়িয়াখানা ও বোটানিকাল গার্ডেন বেড়িয়ে গেছে। আমি পরে শুনেছি। সে ঢাকায় আসে কিন্তু আমার মুখখানা দেখার অগ্রাধিকার নিয়ে কখনো আসে না। কথা ও কাজের কোনো মিল কখনোই থাকে না। সে নিজেকে খুব চালাক ভাবে। যদিও তার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা কাজ করে, তাই বুদ্ধি ধরা পড়ে যায়। তার বুদ্ধি যে হালকা, তা সে নিজেও বুঝতে চায় না। তার অগ্রাধিকার তালিকায় সে প্রথমেই রেখেছে হাজি কেরামতকে, যার কথা সে সব সময় আমার কাছে লুকায়। তারপর তার ছেলেমেয়েকে, তারপর তার বিশাল ধন-সম্পদকে। এরপর হয়তো আমাকে। এভাবে ওয়েটিং লিস্টে আমার থাকা আদৌ ঠিক নয়। আমি ওয়েটিং লিস্টের চার নম্বরে আছি। আমার কাছে সত্য গোপন করে সে কী শান্তি পায়, কী সুবিধাই-বা পায়, সেই-ই ভালো বোঝে। তবে তথ্য গোপন করার কারণে সে সব সময় অস্থিরতায় ভোগে, এটা আমি বুঝি। এতে তার শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। আমার কারণে তার কোনো ক্ষতি হতে আমি কখনোই দেবো না। আমার সাথে যোগাযোগ না থাকলে তার কিছুদিন একটু খারাপ লাগবে, তবে দোটানা অবস্থা থেকে নিস্তার পাবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। এতে জীবনে একটা স্থিরতা ফিরে পাবে। যদিও স্মৃতির গ্লানি, অন্তর্দহন ও আত্মপীড়ন আমৃত্যু তার পিছু ছাড়বে না। আমার উচিত তার মঙ্গল যাতে হয় সেটাই করা। সে ভুল বুঝলেও তার ভালোর জন্যই আমাকে এগুলো করতে হবে। সে হয়তো তার ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য হাজি কেরামতের সাথেও সম্পর্ক ঠিকঠাক ও টিপটপ রাখতে চায়, তার সাথে প্রকৃত সম্পর্কটা গোপন রেখে আমার কাছেও ভালো থাকতে চায়। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি তার তালবাহানা সবটুকুই বুঝে ফেলেছি, এটা তাকে বুঝতে দেওয়া আমার উচিত হবে না। আমার পথ আমাকেই তার অজান্তে বেছে নিতে হবে। তার সাথে কোনো তর্কে

জড়ানো আমার উচিত নয়। সে যেহেতু হাজি কেরামতকে মনেপ্রাণে আপন ভেবেছে, তাকে হাজি কেরামত সরকারের সাথে স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে থাকতে দেয়াই সমীচীন। তাকে কোনোভাবে বিরক্ত করা আমার উচিত হবে না। তাছাড়া আমি তো তাকে বার বার মিথ্যা কথা বলার চর্চা করাতে পারিনে। এটা আমার মূল্যবোধের পরিপন্থী।'

মুর্তজা কোনোদিনই পরকীয়াতে বিশ্বাসী নন। স্বপ্না তার সাংসারিক জীবনের কষ্টের কথা বিভিন্নভাবে তুলে ধরাতে এবং মুর্তজার কাছে চলে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি জীবনের শেষবিকেলের দিনগুলোতে স্বপ্নাকে বৈধভাবে গ্রহণ করতে আশান্বিত হয়েছিলেন। অথবা দূরে থেকে তার কল্যাণ কামনা ও ভালো-মন্দের খোঁজখবর রাখতে চেয়েছিলেন। বিপদে পাশে থাকতে চেয়েছিলেন, কারণ মুর্তজা স্বপ্নাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসেন। এর বাইরে কিছু নয়।

মুর্তজার মনের ঘুণ একটাই, 'আমাকে সত্য কথাটা বললে অসুবিধা কী ছিলো? আমার শরীরটাও তো তার সুখ-শান্তির জন্য চিন্তায় চিন্তায় দিনে দিনে শেষ করে দিয়েছি। আমার ভালোবাসা ও তার জন্য ত্যাগের পরিমাণ বোঝার ক্ষমতা তার কি একেবারেই নেই? আমার জীবনের এ আবার কোন পরিণতি? ছেলেমেয়ে-সংসার, দাম্পত্য জীবন তো অনেক আগেই শেষ। প্রথম জীবনে স্বপ্নার ছোবল খেয়ে অনেক কষ্টে ভগ্নমনে দিন কাটাচ্ছিলাম, কিন্তু তাকে চেনার শেষাংশ বাকি ছিল। এটাই হয়তো তার শেষ ছোবল, এতে আমি যে ধরাশায়ী হয়ে গেলাম! আমার জীবনের অস্তিত্ব কোথায়? এখন থেকে ভবিষ্যতে আমি না-পারবো স্বপ্নাকে বিশ্বাস করতে, না-পারবো আগের মতো একাকী হয়ে জীবন চালিয়ে যেতে। আমার এখন কী করা উচিত? আমার তো একূল-ওকূল দুকূলই শেষ। যেখানেই থাক দিন শেষে পাখি নীড়ে ফিরে আসে, আমি কোথায় ফিরবো? আমি তো নীড়হারা পাখি। আমার কোথাও আর ঠাঁই নেই! তারচেয়ে'–

'... হোক না সে-পথ যতই বিপুলতর
ফিরবে নীড়ে ঘরের টানে সাঁঝের পাখি যত,
আমি ফিরবো না আর হারিয়ে যাব সন্ধ্যাতারার মতো'

মুর্তজা শেষ জীবনে এসে চেয়েছিলেন, স্বপ্না তাঁর কাছে আসতে পারুক বা না-পারুক, সেটা বড় কথা নয়। মুর্তজা ভালোবাসার প্রতিদানে একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে আমৃত্যু পাশে পাবেন। স্বপ্না মুর্তজার ভালোবাসাকে যথাযথ মূল্য দেবে। শুধু সত্য কথাটাই

মুর্তজাকে বলবে। সম্পর্কটা হবে পারস্পরিক খাঁটি বিশ্বাসের নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক। অথচ স্বপ্নার কথার উপর আদৌ নির্ভর করা যায় না। তার আত্মবিশ্লেষণ, আত্মোপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসায় গলদ রয়ে গেছে। মুর্তজাকে স্বপ্নার অবমূল্যায়ন মুর্তজার মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

তিনি এখানে বসেই সেতুকে ফোন দিলেন। সেতু ফোন ধরলো, 'দাদা, কেমন আছেন? আজ সকালে ট্রেনে আপা মেয়েকে সাথে নিয়ে ঢাকায় গেছেন দুলাভাইকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে।'

'বেশ ভালো। তুমি তো প্রথম থেকে অনেক দায়িত্ব পালন করে আসছো। আমার কাছে সব সময় তুমি সত্য কথা বলো, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমিও তোমাকে বিশ্বাস করি। এবার আমার হয়ে একটা দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে। তুমিই না বলেছিলে, তোমার আপা আমাকে প্রতারক হিসেবে জানে এবং দেখা হলেও কথা বলবে না, প্রয়োজনে দু কথা শুনিয়ে দেবে। আমি আমাকে নিয়ে দূরে আছি, দূরেই থাকতে চাই। আমি তার সাথে কথা বলতে গিয়ে দু কথা শুনতে চাইনে। আমার একটা চিঠি বিশ্বস্ততার সাথে আমার পক্ষ থেকে তাকে পৌঁছে দেবে? প্লিজ তুমি অমত করো না। এটা তোমার দাদার প্রতি শেষ দায়িত্ব।'

'আচ্ছা দেবো।'

'জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি তো। তাকে অসংখ্য চিঠি প্রথম জীবনে লিখেছি। সেও লিখেছিল। এ চিঠিটা হয়তো-বা শেষ চিঠি। এর দায়িত্ব তোমার। বেশ, ভালো থাকো। শরীরের প্রতি যত্ন নিও। তোমার জন্য না-হলেও তোমার ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা কোরো। তোমার কথা আমার আজীবন মনে থাকবে। তুমি সুখী হও। বড় ভাই হিসেবে এই আমার দোয়া।'

মুর্তজা সেতুর আগে-বলা কথাগুলো মাথায় এনে ভাবছে, সেতু তার আপা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত যে মন্তব্যগুলো দেখা হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর কাছে করেছিল, তার বলা প্রতিটা বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবই আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। দু বোন এক হাঁড়িতে ভাত খেয়ে সেই ছোটোবেলা থেকে এতটা বছর পাশাপাশি জীবন কাটাচ্ছে। বলা যায়, সেতু তো তার আপাকে যথার্থই চিনেছে। তার চেনার মধ্যে কোনো ভুল আজ মুর্তজা কোথাও পেলেন না। এ তথ্য স্বপ্নার কাছে অজানাই রয়ে যাবে। স্বপ্না সম্বন্ধে সেতুর মূল্যায়ন শুনলে স্বপ্না সেতুর উপর অযথাই রেগে যাবে, কিন্তু নিজের স্বভাবের কোনোই পরিবর্তন করবে না।

মুর্তজা ভেবে দেখলেন, মানুষের স্বভাবের মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয় না, মূল রয়ে যায়। সাবধানতা ও সচেতনতা দিয়ে তা সাময়িকভাবে ঢেকে রাখা যায়। পরিণামে বা কখনও কখনও কোনো-না-কোনোভাবে মনের অজান্তেই ঘটনাক্রমে তা প্রকাশ পেয়েই যায়।

মুর্তজা সেতুর সাথে ফোনের লাইনটা কেটে দিয়েই হাতের ফোনটা মেঝেতে জোরে এক আছাড় মেরে ভেঙে চুরমার করে ফেললেন। 'এই মোবাইল ফোনই আমার জীবন-হন্তারক! এই ফোন না-হলে স্বপ্না আমার সাথে এভাবে ভুল তথ্য দিয়ে এতোদিন প্রবঞ্চনা করতে পারতো না।' ফোনের সিমটা বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লো। মুর্তজা সেটা কুড়িয়ে এনে প্রথমে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ার চেষ্টা করলেন। অনন্যোপায় হয়ে টেবিলের উপরে রাখা পট থেকে চাকু নিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটলেন এবং ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। নির্বাক হয়ে চেয়ারে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। একটু পর মেঝেতে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় এক সহকর্মীর রুমে গিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিলেন।

অফিসে দুপুরের খাবার এলে খেলেন না, ফিরিয়ে দিলেন। একটু দেরিতে একেবারে পড়ন্ত বিকেলে কলেজ থেকে তাঁর ভাড়া করা নির্জন সেই চিলেকোঠায় ফিরলেন। ফেরার পথে পরিচিত দোকান থেকে দু পাতা ঘুমের ওষুধ কিনলেন। পাঁচ তলার চিলেকোঠায় ওঠার আগে কী-যেন-কী মনে করে চার তলায় বাড়ির মালিকের ফ্লাটে নক করলেন। গৃহকর্ত্রী দরজা খুলে দিলেন। মুর্তজা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাবী, ভাই বাসায় নেই?' ভাবী উত্তরে 'না' বললেন। মুর্তজা ভাবীকে বললেন, 'অনেক দিন ধরে আপনাদের এই ছাদে আমি স্বাধীনভাবে বাস করছি। আপনারা সহযোগিতা ও আন্তরিকতা না দেখালে হয়তো আমার এভাবে একাকী বাস করা সম্ভব হতো না। এ জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমার জন্য দোয়া করবেন। ভাইকে আমার সালাম দেবেন।' ভাবীর সাথে কথা বলে হাসিমুখে উপরে উঠে এলেন।

মুর্তজা রুমের তালা খুলে পোশাক পরিবর্তন না করেই খাটের উপর সটান শুয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা লেগে এলো। উঠলেন না। আজ তাঁর ভাবনার শেষ নেই। মাঝে মাঝে ভাবনায় খেই হারিয়ে ফেলছেন।

ভাবছেন, স্বপ্নার স্বপন সবটাই তো মিছে। তিনি কেন অলীক স্বপ্ন দেখতে গেলেন! সোনার পাহাড়ে উঠতে যাওয়ার আগে পিছলে পড়ার ভয় করা উচিত ছিল। তার দু কূলই ভেঙেছে। সে-সাথে এখন তো তার মনের কূলও ভেঙে গেছে। তাঁর দুটো

ছেলেমেয়ে আছে। তারা মা-মুখী। তারা দুজনেই সাবালক। তাদের পথ তারা বেছে নিতে পারবে। সালেহার দেনমোহরের টাকাও শোধ দিয়ে ফেলেছেন। ছেলেটা নিশ্চয়ই তার মাকে ফেলবে না। মেয়েটা ভালোভাবে লেখাপড়া শিখছে, অর্থনৈতিকভাবে নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে। তাঁর জীবনে কীই-বা আর চাওয়ার আছে, পাবারই-বা কী আছে? স্বপ্না এ দীর্ঘ বছর যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে, ভালোভাবে সংসার করবে। জগতে কে কার! এটা তার রাতের একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে নেবে। সবার জীবনই যে সার্থক হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তাছাড়া, 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' বলে তো একটা কথা আছে। তিনি তো বর্তমান পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার জন্য যোগ্য নন। তাঁর তো নিঃশেষ হয়ে যাবারই কথা। স্বপ্না তার দাম্পত্যজীবনে অসুখী এবং খুব কষ্টে আছে বলে তাঁকে ভুল বুঝিয়েছিল বলেই-না তিনি তার ইচ্ছেমতো তার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া ঘর ভাঙার ইচ্ছে তো তাঁর কোনোদিনই ছিল না, এখনো নেই। ইচ্ছে থাকলে তাকে অনেক আগেই ফোন করতে পারতেন, তাকে ফুসলাতে পারতেন। তা তিনি করেননি। স্বপ্না এই শেষ জীবনে তাঁকে আঁকড়ে ধরে সুখী হতে চায়, সে-ই তা বলেছিল। তিনি শুধু বলেছিলেন, 'এতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। আসবে না-আসবে এটা তারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।' কিন্তু তাঁর সাথে মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নেয়া, তাঁকে নিয়ে মনে মনে এতো বুদ্ধি খাটানো, এতো কপটতা করা তাঁর আদৌ পছন্দনীয় নয়। স্বপ্নার বোঝা উচিত ছিল, আজ হোক আর কাল হোক, তার এ প্রবঞ্চনা ধরা পড়বেই। জিদের বশবর্তী হয়ে মানুষ তো অনেক কিছুই করে। এমন অনেক তথ্যই তো মুর্তজার হাতে আছে, যা দিয়ে তিনি ইচ্ছে করলে এখনই স্বপ্নার দাম্পত্য জীবনটা তছনছ করে দিতে পারেন, তার এতো সুখের আশার ঘরে আগুন জ্বেলে দিতে পারেন। কিন্তু স্বপ্না তাঁর ভালোবাসার মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হলেও, তিনি নিজে স্বপ্নার প্রতি ভালোবাসার মর্যাদা দেবেন, কখনও বিশ্বাসভঙ্গ করবেন না।

আরো ভাবছেন, সব কিছুতে যুক্তি ও তর্ক করে জেতা যায় না। আত্মজিজ্ঞাসায় জয়ী হওয়াটাই প্রকৃত জয়। তবে এই আত্মজিজ্ঞাসাই যদি কারো না থাকে? কিংবা এই আত্মজিজ্ঞাসার প্রোপজিশন যদি ভুল হয়? মানুষ তার স্বার্থের কথা ভেবে এভাবে জিভটা উল্টিয়ে ফেলে কীভাবে? স্বপ্না তাকে আপন ভাবতে জানে কিন্তু আপন হতে জানে না। স্বার্থ বোঝে, কিন্তু স্বার্থত্যাগ করতে জানে না। সে কেন তাঁর সাথে এভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করলো! কোনো প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পান না মুর্তজা।

মুর্তজা অস্থির হয়ে উঠেছেন। আবার ভাবছেন, সে কি জীবনে কোনোদিন ভুলটা বুঝতে পারবে? সে কি জানে প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম? যে অবলম্বনকে সে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ভাবছে, তা যদি কখনো কোনো কারণে হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন সে কী করবে? সবাই তো জানে প্রকৃতির কাছে মানুষ অসহায়। তাঁর মতো একজন নিঃস্বার্থ বন্ধুকে আজীবন ধরে রাখতে না-পারা স্বপ্নারই ব্যর্থতা। মুর্তজার আত্মঘাতী প্রতিশোধ, 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেবো না ভুলিতে।'

বেশ রাত হয়ে গেছে। খাবারের কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই। উঠতেও ইচ্ছে করছে না। অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার টেবিলে বসলেন। চিঠিটা তাঁর লিখতে হবে। এটাই তাঁর শেষ চিঠি। কিন্তু কী লিখবেন মাথায় কিছুই আসছে না। ল্যাপটপটা চালু করে পুরোনো দিনের গান দিলেন। গানও যে তাঁর কানে আজ ঢুকছে না! অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। ভাবছেন, গান শুনতে শুনতে চিঠিটা লিখবেন। একটা গান দিলেন:

'আমার মায়াডোরে বাঁধা ও-মন ঝরিয়ে চোখের জল
অন্যখানে চল রে ও-মন অন্যখানে চল,
এবার অন্যখানে চল ...।'

স্বপ্নাকে কী বলে সম্বোধন করবেন মুর্তজা বুঝে উঠতে পারছেন না। তিনি ভাবছেন তো ভাবছেনই। আবার গানের দিকে কান গেল। শুনছেন, একই গান শেষ হয়ে আবার সেটাই প্রথম থেকে বেজে চলেছে। এবার বাজছে,

'দেবার মতো যা ছিল মোর সবই দিয়ে যাই
নেবার মতো নেই তো কিছু নিলাম না-যে তাই,
আমার বুকের আগুন শুধুই আমি করেছি সম্বল,
এবার অন্যখানে চল...।'

চিঠির দিকে মন দিলেন মুর্তজা। সিদ্ধান্ত নিলেন, চিঠিতে কোনো সম্বোধন থাকবে না। এমনিতে কয়েকটা কথা দিয়ে শেষ করে দেবেন। কিন্তু সে কথা কয়টা কী? ভাবছেন মুর্তজা। গানের দিকে আবার মন গেল তাঁর। গান বেজে চলেছে,

'মেঘের আশে চাতক থাকে মেঘ যে ভেসে যায়
জীবন গাঙে চর জেগেছে এ-কোন অবেলায়,
আমার বুকের কাঁটায় ফুটলো না হায় সুখের শতদল,
এবার অন্যখানে চল।'

এবার মুর্তজার মাথায় ঢুকলো আরেকটা প্রশ্ন। পঁয়ত্রিশ বছর পর ট্রেনে দেখা হবার স্মৃতিস্বরূপ মুর্তজা অল্প দামের একটা স্মৃতিচিহ্ন স্বপ্নাকে কিনে দিয়েছিলেন। স্বপ্না তার পছন্দমতো ওটা বেছে নিয়েছিল। ধর্মগ্রন্থের শপথ করে বলেছিল, যতদিন সে বেঁচে থাকবে, মুর্তজার এ স্মৃতিচিহ্ন সে সব সময় ব্যবহার করবে এবং বহন করে বেড়াবে। মুর্তজা ভেবে পায় না, তাঁর অবর্তমানে অতি নগণ্য সেই স্মৃতিচিহ্ন ব্যবহারের শপথও কি স্বপ্না ভেঙে ফেলবে? না-কি ধর্মের শপথটা সে মেনে চলবে? না-কি ফেরত দিতে চাইবে সে-স্মৃতিচিহ্ন? মুর্তজার ধারণা, স্বপ্না যদি সত্যিই মুর্তজাকে ভালোবেসে থাকে, সে এ স্মৃতিচিহ্ন ব্যবহার করবে— তা মুর্তজা যত দূরেই থাকুক। তবে তার হালকা বুদ্ধি ও খামখেয়ালি কাজের উপর নির্ভর করা কঠিন! মুর্তজার কথা, স্বপ্না ফিরিয়ে দিতে পারবে কি জীবনের এই শেষবিকেলের হৃদয়ভেদী গভীর ছোঁয়া, পথরেখা? যে-পথ নিবিড়-স্নিগ্ধ গোপন ভালোবাসায় আঁকা? যে ভালোবাসার মূল্য সে দিতে জানে না, তা কেন মিছেমিছি ধরে রাখা? ধিক! তার নির্বোধ কপটতায়, যে-পথের প্রান্ত বাঁকা। স্বপ্না হাজি কেরামতকে আপন ভেবে মুর্তজার এ স্মৃতিচিহ্ন ব্যবহারে যদি অস্বস্তি বোধ করে, সে-ক্ষেত্রে মুর্তজার পরামর্শ হলো— স্বপ্নার কাছে মুর্তজার যে একটা ছবি আছে, সেটা মেঝেতে ফেলে তার উপর স্মৃতিচিহ্নটা রেখে স্বপ্না ইচ্ছেমতো পদপিষ্ট করবে। পূর্ণ তৃপ্তি মেটার পর পার্শ্ববর্তী কোনো ডোবায় ছবি ও স্মৃতিচিহ্ন ছুড়ে ফেলে দেবে। এতে হয়তো স্মৃতির দংশন থেকে স্বপ্না চিরদিনের জন্য মুক্তি পাবে।

চিঠির ভাষা মাথা থেকে আদৌ আসছে না। তিনি ভাষাহীন, ভাবলেশহীন বসে আছেন চেয়ারে।

মুর্তজা ভাবছেন, 'আচ্ছা আজই যদি আমার শেষ রাত হয়, তাহলে আজ সেপ্টেম্বর মাসের ছাব্বিশ তারিখ। শুধু স্বপ্নাই হয়তো জানবে আমার শেষ দিন কবে। বাকিরা অন্যদিন বেছে নেবে। চার বছর আগে এই সেপ্টেম্বর মাসের শেষের কোনো একদিন সাড়ে তিন দশক পর স্বপ্নার সাথে দেখা হয়েছিল। এ-মাসে দেখা হবার চার বছর পূর্তি হলো। স্বপ্নার পক্ষে সঠিক দিনটা পালন করতে সুবিধা হবে। কিন্তু স্বপ্না আত্মপ্রবঞ্চক হলে নিশ্চয়ই শেষ দিনটা পালন করা দূরের কথা, মনেও রাখবে না, দিনে দিনে ভুলে যাবে। দু থেকে তিন দিন পর সবাই জানবে আমার অবস্থার কথা। সে-কদিন হয়তো স্বপ্না যশোরে ফিরে যাবে। এলাকার সবাই খবর পেয়ে যাবে। আমার খবরে সেতু হয়তো খুব কান্নাকাটি করবে। আমি নিশ্চিত, সেতু সাথে সাথে তার আপার বাসায় যশোর চলে যাবে। ভাববে, আপাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। সেতু গিয়ে দেখবে তার আপা সন্ধ্যার আগে বিছানায় আলতোভাবে শুয়ে আছে। আমার এ সংবাদ দেওয়ার সাথে

সাথে স্বপ্না আশ্চর্যান্বিত হবে। বিছানা ছেড়ে উঠে বসবে। বলবে, 'তা কী করে সম্ভব! এ কী বলছো তুমি! না, কথাটা ঠিক নয়। এ হতে পারে না।' সেতু বলবে, 'না— পথে, বাজারে সবাই বলাবলি করছে, কথাটা ঠিক।' তারপর স্বপ্না কিছুক্ষণ নীরব থাকবে, কষ্ট পাবে। এতে তার কোনো দোষ নেই— এটাই ভাবার চেষ্টা করবে। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় আসার চেষ্টা করবে। নিজেকে সামলে নেবে, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাববে, 'যে চলে যেতে চায় তাকে চলে যেতে দেওয়াই ভালো।' মেয়েটা রুমে এলে তার সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে। হাজি কেরামত সরকার বাসায় ফিরলে হেসে হেসে কথা বলবে। রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সেতু হয়তো রান্নাঘরে গিয়ে বলবে, 'আপা, তুমি এতো নিষ্ঠুর। তোমার কি মন বলতে কিছু নেই? আজ তোমার ঘরের কারো খারাপ খবর শুনলে তুমি কি এতো স্বাভাবিক থাকতে পারতে? পারতে কি রান্নাঘরে এভাবে রান্না করতে, খেতে?' স্বপ্না হয়তো কথার উত্তর দেবে না, অথবা বলবে, 'একজন মারা গেলে আমার কীই-বা করার আছে?' এই তো স্বপ্নার সাথে আমার আন্তরিকতা, ভালোবাসার গভীরতা! ভালোবাসার উত্তম প্রতিদান।'

চিঠির ভাষাটা শুরু করলেন এভাবে:

'তোমার কথা, বিবেক, মন ও কাজ আত্মস্বার্থের উপর ভিত্তি করে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। তোমার মন ও কাজের কোনো পূর্বানুমান করা যায় না। আমি তোমার সংসারের সুখ-শান্তির পথে কোনোভাবে বাধা হতে চাইনে, তা আমার জীবনের বিনিময়েও না। তোমার সুখই আমার শেষ চাওয়া।' — ইতি, বদলি খেলোয়াড় নম্বর— চার।

চিঠিটা লিখে মুর্তজা টেবিলের উপর রাখলেন। এ-রাতে কাকে দিয়ে কুরিয়ারের মাধ্যমে সেতুর নামে পোস্ট করতে হাতে দেবেন, সেটাই তিনি ভাবছেন।

একটা গান বার বার বাজছে বিধায় বিরক্তি এলো, অন্য গান দিলেন। স্বপ্না খুব নজরুলগীতি পছন্দ করতো। তাঁরও নজরুলের বিরহের গান পছন্দ। একটা গান খুঁজে বের করলেন, ভলিয়মটা একটু বাড়িয়ে দিলেন,

'এই কি গো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে,
এই কি গো শেষ দান।
মোর আরো কথা, আরো কথা ছিল বাকি
আরো প্রেম আরো গান,
এই কি গো শেষ দান...।'

সন্ধ্যা থেকে বুকের মাঝখানে ব্যথা করছে, ব্যথাটা চিনচিন করে বেড়েই চলেছে। মুর্তজা ভাবছেন, গ্যাসের ব্যথা। দুপুরে ও রাতে খাওয়া হয়নি তাই। একবার ভাবলেন, ব্যথাটা একটু কমলে চারতলায় গিয়ে ছেলেমেয়েকে একবার ফোন করবেন। আবার ভাবলেন, ব্যথাটা কমলে না-কি সালেহার সাথে একবার দেখা করে আসবেন? মনটা বিদ্রোহ করে বসলো। সালেহার সাথে দেখা? আমার জীবিত মুখ তাকে দেখিয়ে কী লাভ!

ব্যথাটা বেড়েই চলেছে। চেয়ারে আর বসতে পারছেন না। বুকটা ফেটে যাবার মতো হচ্ছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। প্রথম জীবনের ভালোবাসার প্রথম মায়ারেখা আজীবন স্মৃতি-বিমলিন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হৃদয়-কন্দরে গেঁথে থাকে। স্বপ্না ভালো থাক, সুখে থাক— এই-ই মুর্তজার শেষ কামনা। স্বপ্নার স্বচ্ছ মুখটা একবার মনের পটে ভেসে উঠলো। আর সহ্য করতে পারছেন না। অগত্যা চেয়ার থেকে উঠেই বিছানায় ঢলে পড়লেন। ভাবলেন, ফোনটা এখন কাছে থাকলে চারতলায় ফোন করা যেত। অনেক চেষ্টা করেও জোরে কাউকে ডাকতে পারলেন না। ল্যাপটপের গানটা তখনো বেজে চলেছে, 'মোর আরো কথা ছিল বাকি, আরো প্রেম আরো গান।' ওদিকে মন দেওয়ার মতো অবস্থা তার নেই। দমটা বন্ধ হয়ে আসছে।

'স্বপ্নের স্বপন সকলি ভুল, পুতুলে খেলছে পুতুল। বাতুলে ধইরাছে তুল খরিদ্দার সব ঠকের মাইয়া।'

তারপর কী হয়েছে মুর্তজা আর জানেন না। তিন দিন পর চারতলার কাজের মেয়েটা দুপুরে ছাদের উপর থেকে ফিরে এসে বললো, 'খালাম্মা, উপরের রুমের ভিতর থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।' গৃহকর্ত্রী বললেন, 'তোর খালুজানকে বল।' দুজনেই উপরের রুমে ছুটে গেলেন এবং মুর্তজার মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন।

মুর্তজা ততক্ষণে আশা-নিরাশাকে পিছু ফেলে জীবনের শান্তি খুঁজে পেয়েছেন।

তাঁর অবিনশ্বর আত্মা অনন্ত নিদ্রা থেকে নিঃশব্দে বলে চলেছেন:

'হেথা এক দরিদ্র পূজারি এসেছিল
তোমা সবাকার দ্বারে,
তারে দূর করে দিলে অনাদরে অপমানে।
হেমন্তের পাতাঝরা গোধূলিবেলায়
এমনি অবসন্ন সন্ধ্যায় যদি মনে পড়ে
সেদিন ফেলবে কি দুফোটা অশ্রুজল, বলো?'